প্রথম প্রকাশ : জুন/১৯৫৯।
প্রথম পুনর্ম্মুদ্রণ: পৌষ ১৪০১/জানুয়ারি ১৯৯৯

প্যাপিরাস-পক্ষে অরিজিৎ কুমার, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন কলকাতা ৭০০ ০০৪ কর্তৃক প্রকাশিত ও সঞ্জয় সাউ, অ্যাস্ট্রাগ্রাফিয়া, ৪০বি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত।

সূচি

টুনটুনির বই -এর একটি রহস্য	৯
জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪
বুদ্ধদেব বসুর কবিতা	৪৪
বাংলা কবিতা ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	৫৮
বিনয় মজুমদার	৭০
স্নবারি থেকে স্লোগানে	৮০
অভিমানী কবির মৃত্যু	৯১
ধর্ম কি বিশ্বাস বলতে একটাই—ভালোবাসা	৯৪
লুকোনো, চতুর এক কবিকে চেনা	৯৯
এই সময়ের ক্ল্যাসিক	১০৮

জ্যোতির্ময় দত্তর প্রবন্ধ সংকলন

টুনটুনির বই-এর একটি রহস্য

পুরাণ কী অর্থে রূপকথা থেকে ভিন্ন

টুনটুনির বই আমাদের অতি পরিচিত; শৈশবে গল্পগুলি বহুবার শুনেছি, এবং এখন এমন বয়সে উপনীত হয়েছি যখন বহুবার শোনাতে হয়। তবু, অতি পরিচয় সত্ত্বেও, গল্পগুলি আজও উপভোগ্য। শুধু উপভোগ্যই নয়। মাঝে মাঝেই এই গল্পগুলি পড়তে পড়তে কোথাও কোথাও থেমে যাই; এর সরল, অনাড়ম্বর প্রচ্ছদের তলায় নানা জটিল রহস্যের উপস্থিতি অনুমান করি। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পিঁপড়ে আর হাতি আর বামুনের চাকর' গল্পটি উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম পরিচয়ে মনে হতে পারে এটাও আরো আরেকটা আষাঢ়ে গল্প; কত দূর অতিরঞ্জন ও অত্যুক্তি করা যায় তারই আরেকটি দৃষ্টান্ত। এক পিঁপড়ে তার পিঁপড়ীর শব গঙ্গায় নিয়ে যাচ্ছিল; পথে সে একটি মৃত হাতির শরীরে প্রবেশ করে। হাতিটিকে শত-শত লোক সরাতে পারেনি; একটি বামুনের চাকর তাকে পুটুলি বেঁধে নিয়ে চলল। এর পর থেকে যা ঘটতে থাকে তা বাক্‌শের মধ্যে বাকশের মতো, অথবা আয়নার মধ্যে আয়নার ছায়ার মতো; প্রতিবিম্বিত বস্তুগুলি আকারে ক্রমক্ষীয়মাণ কিন্তু সংখ্যায় অশেষ। সেই সাতশো মোষ যে রাখাল ট্যাঁকে করে বাড়ি ছুটতে পারে, কিংবা যে রাজকন্যার চক্ষুপতিত ধূলিকণা আসলে মল্লরত দুই মহাবল প্রমাণিত হয়, তাদের আকার না-জানি কী বিশাল!

'রাজার মেয়ে চোখ বুজে বললেন, 'দাসী, দেখ, দেখ, আমার চোখে কী পড়েছে!"

'দাসী কাপড়ের কোণ পাকিয়ে, তাতে থুতু লাগিয়ে, তাই দিয়ে রাজকন্যার চোখের ভিতর থেকে ভারি চমৎকার একটি ছোট্ট কালো জিনিষ বার করলে।'

কী অবহেলা, সেই বলগর্বিত মল্লদের প্রতি! আমাদের দৃষ্টিতে যারা পুকুর-পুকুর জল খায়, বটগাছ দিয়ে গলায় ছিপি আঁটে, তারা এই রাজকন্যার তুলনায় ধূলিকণামাত্র। কিন্তু মজাটা এই, এখানে শুধু আকারেরই পরিবর্তন ঘটে, চরিত্রের নয়। এই রাজকন্যা ও এই দাসী, নিতান্তই আমাদের চেনা মানুষ, তাদেরও শাড়ির খুঁটে থুতু মাখিয়ে ময়লা তুলতে হয়। রূপকথায় এমনই ঘটে; একটির মধ্যে আরেকটি ঘটনার অনুপ্রবেশের এখানে অন্য গভীর তাৎপর্য নেই।

অথচ, দ্বিতীয় বার পড়লেই, গল্পটির কাঠামোর সঙ্গে পুরাণোক্ত অনেক কাহিনীর সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইন্দ্র একবার অসুরদের পরাস্ত করে বিজয়গর্বে বিশ্বকর্মাকে

এমন এক স্বর্গ রচনা করতে বললেন যার তুল্য কিছু ত্রিভুবনে নেই।* বিশ্বকর্মা গড়েই চলেন; মায়াময় গগনচুম্বী প্রাসাদ যার দেয়াল নেই অথচ অন্দর ও বাহির আছে; প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রকোষ্ঠ; উদ্যানের পর উদ্যান। কিন্তু কিছুতেই ইন্দ্রের তুষ্টি হয় না; তিনি বিশ্বকর্মার কাছে আরো সংযোজন, আরো বৈচিত্র্য, আরো উদ্ভাবন দাবি করে চলেন। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বিশ্বকর্মা গেলেন উচ্চতর আরেক লোকে, যেখানে ব্রহ্মার অধিষ্ঠান। ব্রহ্মা বিশ্বকর্মার আবেদন শুনে বললেন, তথাস্তু। অতঃপর, তিনিও আরোহণ করলেন আরো উচ্চ লোকে যেখানে বিরাজমান স্বয়ং বিষ্ণু। বিষ্ণু শুনলেন বিশ্বকর্মার আবেদন। পরদিন সকালে ইন্দ্রের সভায় এক ব্রাহ্মণ বালকের আবির্ভাব হলো। সে ইন্দ্রকে বললে: 'হে দেবরাজ, আমি আপনার নতুন পুরীর সুখ্যাতি শুনে সেই বিস্ময় দর্শন করতে এসেছি। শুনেছি এরকম পুরী এর আগে অপর কোনো ইন্দ্র নির্মাণ করাননি।' ইন্দ্র সকৌতুকে বালককে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি তাহলে আমারও পূর্ববর্তী কোনো ইন্দ্রের অস্তিত্ব অবগত আছো?' বালক সরলভাবে উত্তর দিল: 'হাঁ, আমি আপনার পিতা, এবং তাঁর পিতা, এবং তাঁরও পিতাকে দেখেছি, এবং আমি সেই ব্রহ্মাকেও জানি যাঁর পলকপাতে আপনার এক যুগ কেটে যায়। এবং বিষ্ণুকেও, ব্রহ্মার এক যুগ যাঁর কাছে মুহূর্তমাত্র। কেবল যে এই ব্রহ্মাণ্ডবাসী শত-শত ইন্দ্রকে আমি চিনি তাই নয়, অর্বুদ ব্রহ্মাণ্ডের উপর অধিষ্ঠিত কোটি কোটি বিষ্ণুর, চরাচরের পর চরাচরের, সৃষ্টির পর সৃষ্টির সহ-অবস্থিতির বিষয় আমি অবগত আছি।' এই বলে বালক মেঝের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। 'ঐ যে মেঝের উপর পিঁপড়েরা সার বেঁধে হেঁটে যাচ্ছে, ওদের প্রত্যেকটি কোনো-না-কোনো জন্মে ইন্দ্র ছিলো। আজ তারা কর্মদোষে অদৃশ্যপ্রায় পিপীলিকা মাত্র।' বালকের বাক্য শ্রবণে ইন্দ্রের জ্ঞানোদয় হলো, এবং তিনি রাজত্ব ছেড়ে বানপ্রস্থের সংকল্প গ্রহণ করলেন।

মূলত, এই পুরাণোক্ত কাহিনীটির গড়ন বাংলাদেশের ঐ লৌকিক গল্পটির মতো। দুটিরই উদ্দেশ্য বৃহতের দর্পভঙ্গ এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধির উপায় আকার ও আয়ুর আপেক্ষিকতা প্রদর্শন। স্পষ্টতই টুনটুনির বইতে সংকলিত এই গল্পটির উৎস কোনো পুরাণ। কিন্তু দুটির মধ্যে তাৎপর্যের বিপুল ব্যবধান। টুনটুনির বইয়ের গল্পটি পড়ে আমরা কেবল কৌতুক বোধ করি। পুরাণ-কাহিনীর শেষে কেবল ইন্দ্রের জ্ঞানোদয় হয় তাই নয়, শ্রোতা কিংবা পাঠকেরও মনে হয় যেন জগৎ ও জীবনের কোনো-একটা রহস্য উন্মোচিত হলো। রূপকথা কেবল গল্প, মধুর কি কৌতুকাবহ, কিন্তু তা গল্পই, কল্পনামাত্র। কিন্তু পুরাণে বর্ণিত ঘটনা হলো কাহিনী, এবং তার বহিরঙ্গ যতই অবিশ্বাস্য হোক, আমরা অনুভব করি যে তার মধ্যে একটা সত্যের বীজ আছে।

সে-সত্যটি কী জাতের তা নিয়ে নানা জনে অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছেন। উনিশ শতকে অনেকে মনে করতেন প্রাচীন ভারতীয়, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় ও গ্রীক

* ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এই অংশটির উল্লেখ হাইনরিখ জিমার তাঁর 'মিথস এণ্ড সিম্বলস ইন ইণ্ডিয়ান আর্ট এণ্ড সিভিলাইজেশন', গ্রন্থে করেছেন।

পুরাণগুলি মানবজাতির শৈশবের রচনা; প্রকৃতির রহস্য ব্যাখ্যাব প্রাক্-বৈজ্ঞানিক মানুষের ব্যর্থ প্রয়াস। তাঁদের মতে এই পুরাণগুলি এখন, নিউটন ও ডারুইন-পরবর্তী জগতে, আমাদের সুন্দর মনে হলেও হতে পারে, কিন্তু কোনো অর্থ উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। এমন একদিন ছিল যখন ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে মানুষ ভয়ে ভীত হয়ে, এই প্রাকৃতিক রহস্যগুলির প্রকৃত কারণ অনুমান না-করতে পেরে তাদের দেবত্ব দান করেছিল। কিন্তু এসব এখন ব্যাখ্যাত হয়েছে; পুরাণের ছায়াময় জগৎ এখন বিজ্ঞানের আলোকিত প্রদেশ।

স্পষ্টতই, পুরাণের এই ব্যাখ্যা হাস্যকর। পুরাণ-রচয়িতারা অনেক বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, অনেক বিষয়ে ছিলেন শিশুর মতো সরল, কিন্তু আবার এমন অনেক বিষয় ছিলো যাতে তাঁদের তুল্য জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁদের পূর্ববর্তী কি পরবর্তী কোনো মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়নি। উনিশ শতকেরও অসংখ্য কীর্তি অতুলনীয়, কিন্তু পুরাণ বিষয়ে ঐ শতকের অজ্ঞতা অপরিসীম। অবশ্য ঐ শতকেরই শেষার্ধে তুলনামূলক ধর্ম ও লোকসাহিত্যের অলোচনার সূত্রপাত হয়, নৃতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের স্থাপিত হয় ভিত্তি এবং এর ফলে এখন পুরাণকে কেবল শিশুকল্পনা বলে উড়িয়ে দেয়ার স্পর্ধা কোনো আধুনিক মানুষের নেই। কিন্তু পুরাণের লক্ষণ ও চরিত্র বিষয়ে এখনো মতের ভিন্নতা আছে; আর পুরাণের কেন্দ্রগত সত্যটি ঠিক কী তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট মতই গড়ে ওঠেনি। এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা তর্ক করুন; এখানে একজন নেহাত সাহিত্যপ্রেমী ব্যক্তি তার কয়েকটি উপলব্ধি প্রকাশের চেষ্টা করবেন। যে গভীর রহস্যে একজন ফ্রেজার কি লেভি-স্ট্রাউস হাবুডুবু খান, সেখানে সফরীই কেবল ফরফরানির সাহস করতে পারে! মজনতালি সরকার কি টুনটুনি ও রাজার গল্প শোনার পর, এইরূপ ধৃষ্টতাই হয়তো স্বাভাবিক মনে হবে।

লোকসাহিত্যের জন্মভূমি

লোকগল্প ও পুরাণের মধ্যে একটি প্রভেদ প্রথমেই চোখে পড়ে; গল্পগুলির প্রচার দেশকালের বাধা মানে না; অন্যদিকে এক দেশের পুরাণ অন্য-কোনো দেশে চলতি নয়। লোকসাহিত্যচর্চার এখন একটি প্রধান শাখা হচ্ছে বিভিন্ন মহাদেশে প্রচলিত গল্পের সংকলন ও বিশ্লেষণ। ইওরোপে এই কাজ গত শতাব্দী থেকে চলেছে; এখন আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্বের প্রায় যাবতীয় গল্পের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা কেবল তালিকা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি; তাঁরা প্রত্যেক গল্পকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে গল্পগুলি কয়কটি ছক-বাঁধা পরিস্থিতির সমষ্টি মাত্র। গল্পগুলির গড়ন শৃঙ্খলাকার যার প্রত্যেকটি বলয় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ছক-বাঁধা পরিস্থিতিগুলি নানান দেশে সেই-সেই দেশ-ও-কালানুগ ছদ্মবেশ ধারণ করেছে, কিন্তু ছকটি সর্বদাই অবিকৃত থাকে। যেমন ভারতবর্ষে উদ্ভূত কোনো কাহিনীতে যদি নায়ক কৌশলে পিতার চোখের সামনে নায়িকার সঙ্গে শয়ন করেন, তবে মধ্যপ্রাচ্যে কৌশলটি হয়তো অবিকৃত থাকবে, কিংবা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হবে, কিন্তু সমাজভেদে

সেখানে প্রতারক নায়ক হবে খোজা ভৃত্য, যে প্রতারিত সে হলো তারই বৃদ্ধ প্রভু, এবং নায়িকা হলো যুবতী প্রভুপত্নী। এই গল্পটিই যখন ইতালিতে প্রচলিত হলো তখন চরিত্রগুলির সামাজিক সম্পর্ক আরো পাল্টে গেছে : এখন চতুর নায়ক বন্ধুর উপস্থিতিতে বন্ধুপত্নীর সঙ্গে সংগম করছেন। কিন্তু মূল পরিস্থিতিটি এক; এবং গল্পটিতে আমরা তারিফ করি নায়কের চাতুর্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও দুঃসাহসের, এবং সে যখন কৌশলে যা তার আইনত অধিকার নয় তা ভোগ করে, এবং প্রাপ্য শাস্তি এড়িয়ে যায়, তখন আমরা নিশ্চিন্ত হই।

লোকগল্পে সর্বত্রই চাতুর্য ও কৌশলের জয়জয়কার। শেয়ালপণ্ডিত কুমিরের ছানাগুলি খেয়ে ফেলেই তৃপ্ত নয়, পদে-পদে কুমিরকে নির্যাতন করে। শেয়াল বাঘকে কেবল রাখালদের দ্বারা প্রহৃত করায় তাই নয়, নিতান্ত অকারণে গোঁজ সরিয়ে বাঘের লেজ কেটে ফেলে, তারপর কচু খাওয়ায় এবং এত যন্ত্রণা দিয়েও তার নির্যাতনেচ্ছা চরিতার্থ হয় না, অবশেষে বাঘকে হাত পা চিবিয়ে খাওয়ার সর্বনেশে বুদ্ধি দেয়। যারা জেতে তারা সর্বদাই হীনবল। হীনবল, কিন্তু ন্যায় যে সর্বদা তাদেরই পক্ষে এমন নয়। তাদের প্রতিশোধস্পৃহা ভয়াবহ। ছোট্ট টুনটুনির ফোঁড়া কাটেনি, এই অপরাধে সে রাজাকে বলে নাপিতকে সাজা দিতে : রাজা অসম্মত হলে সে ইঁদুরকে রাজার ভুঁড়ি ফুটো করে দেয়ার উসকানি দেয়। ইঁদুর তাতে না-রাজি হলে, সে বেড়ালকে বলে ইঁদুর মারতে এইভাবে সে একটির পর একটি অন্যায় আব্দার করে চলে, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর শক্তির কাছে। অবশেষে, অন্যকে উৎপীড়নের প্রস্তাবে ক্ষুদ্র মশা অতি ব্যগ্রভাবে রাজি হয়। এবং সর্বদা যে দুর্বল সে যে কেবল নিজের চাতুর্যের দ্বারা জয়ী হয় তা নয়; পান্তাবুড়ির ঝুলিতে নিতান্ত কাকতালীয়বশত জড় হয় বেল, শিঙিমাছ, ক্ষুর, অকারণে বোকা জোলার সহায়তা করে চতুর শেয়াল। সম্পূর্ণ এক অযৌক্তিক, অনৈতিক জগৎ—যেখানে জয় কি পরাজয়ের সঙ্গে ন্যায়-অন্যায়ের সম্পর্ক নেই, যেখানে শঠও জিতে যায় কৌশলে এবং বোকাও-মাঝে-মাঝে ভাগ্য কি অপরের বুদ্ধিবলে জয়ী হয়।

জগতের এই ছবি একবারে ন্যাকামিবর্জিত। বাঙালির মিনমিনেপ্যানপেনে জাত বলে কুখ্যাতি আছে; আমাদের লোকসাহিত্য পড়লে এরকম ধারণা হয় যে এই খ্যাতি কেবল আমাদের মধ্যবিত্ত পুরুষদের দ্বারা অর্জিত। আমাদের নাটক-নভেলের ক্রন্দন আর অশ্রুপাত আর বিলাপের পর লোকগল্পকারদের এই বিশুষ্ক বাস্তবতার বাতাস স্বাস্থ্যদায়ক ঠেকে; এঁরা জানেন ঈশ্বর নেই, জগতে নিয়ম নেই, কার ভাগ্যে কখন শিকে ছেঁড়ে কেউ বলতে পারে না। এই গল্পগুলির শিক্ষা : ক্ষমতাবানকে সন্দেহের চক্ষে দেখো; সব সময় চোখ খোলা রেখো, কারণ কখন কী যে ঘটবে কিছুই বলা যায় না, কিন্তু এটুকু জেনো যে সুযোগ এলে তাকে ছাড়তে নেই; গুঁড়ির ফাঁকে যদি থাকে বাঘের লেজ তবে অলক্ষ্যে গোঁজটি তুলে নিও। আর, ক্ষমতাবানকে সব সময় মিষ্টি কথায় তুষ্ট রেখো।

এই বাস্তববাদী দর্শন কেবল ধর্ম, কি নৈতিকতার প্রতি আস্থাহীন তা-ই নয়,

এটি ভয়ানকভাবে অবৈপ্লবিক। জগৎ চিরকাল দুর্বল কি মূর্খের প্রতি ক্ষমাহীন; যে চতুর সে জানে এই ব্যবস্থার কোনো নড়চড় নেই। সে কেবল প্রস্তুত থাকতে পারে কখন ক্ষমতাবানকে ঠকিয়ে কি কৌশলে কিছু অস্থায়ী সুবিধা আদায় করা যায়। কিন্তু স্থায়ী কোনো পরিবর্তন কেউ আশা করে না, ঘটে না সম্পর্কের পরিবর্তন। ঐ সমাজ পরিবর্তন করে নয়, ঐ সমাজের মধ্যে থেকেই, ঐ সমাজের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে নয়, সেগুলি সুবিধে মতো কৌশলে ব্যবহার করেই চতুর দুর্বল তার উদ্দেশ্য সাধন করে। মধ্যপ্রাচ্যের 'সুরভিত উদ্যান' নামক সংকলনেও একই ব্যাপার ঘটে। ভৃত্য যখন প্রভুর সামনে প্রভুপত্নীর সঙ্গে সংগম করছে, তখনো প্রভু প্রভুই, তখনো, ভৃত্য নারীটির পতিত্ব দাবি করছে না, এবং গল্পটির আসল মজাই হলো যে এটা যুদ্ধ নয়, এটা ছলনা। অর্থাৎ বিশ্বসংসার একটা হৃদয়হীন খেলা, যেখানে নিয়মগুলি অপরিবর্তনীয় কিন্তু নিয়মগুলিকে সুযোগ মতো ব্যবহার করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করা যায়।

আমার বিশ্বাস এই পরম নীতিহীনতাই লোকগল্পের এরকম দ্রুত ও ব্যাপক প্রচারের কারণ। ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কোনো ব্যবধানই লোকগল্পের অলঙ্ঘ্য নয়। কোনো-কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি দেখিয়েছেন যে উভয় আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গদের আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে মার্কিন আদিবাসীদের মধ্যে অসংখ্য নতুন গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। এক শতাব্দীর মধ্যে গল্পগুলির চরিত্রের নাম পাল্টে গেছে; স্থানীয় সামাজিক সম্পর্ক অনুযায়ী সম্পর্কগুলির অদলবদল করে নেয়া হয়েছে। এত দ্রুত প্রচার ও দেশকালানুযায়ী সংশোধন সাহিত্যের অন্য কোনো অঙ্গের হয় না। অষ্টম ও নবম শতকের কী দ্রুত ভারতবর্ষ থেকে পুরনো পৃথিবীর সর্বত্র লোকগল্প ছড়িয়ে পড়েছিল, ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়। এত গল্পের উৎস ভারতবর্ষ যে উনিশ শতকে অনেকের এমন ভ্রমও হয়েছিল সকল গল্পেরই বুঝি বা ভারতবর্ষই জন্মভূমি। কিন্তু বিদেশ থেকে যে আমরাও বহু গল্পের ছক আমদানি করেছি তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ আছে; টুনটুনির বইয়েও বিরল নয়; বোকা জোলা ও শেয়ালের গল্পটির উৎস সম্ভবত পূর্ব ইওরোপ।

পুরাণ ও ইতিহাস

ভারতবর্ষ থেকে এত গল্প ছড়িয়েছে, অথচ পুরাণোক্ত কাহিনীগুলি ভারতবর্ষেই রয়ে গেল। প্রথম ধরণের গল্পগুলি উপভোগের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাসের কোনো যোগ নেই, কিন্তু দ্বিতীয় ধরণের কাহিনীগুলির সঙ্গে স্পষ্টতই আছে।

অবশ্য পুরাণের অনেক কাহিনী গল্প হিসেবেও এত উৎকৃষ্ট যে লোক-সাহিত্য কাহিনীর অর্থ বর্জন করে কেবল কাঠামোটি আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু মূলত পুরাণ-কাহিনী কোনো রহস্যের উন্মোচন, এবং ঐ কেন্দ্রগত সত্যটিই তার প্রাণ। এই প্রসঙ্গে লোকগল্পের সঙ্গে পুরাণের আরেকটি পার্থক্য নির্দেশ করা যায়: লোকগল্পের কাঠামোটি যদিও দেশে-দেশে ও ভাষান্তরে অবিকৃত থাকে, তার বহিরঙ্গ কিন্তু

একান্তভাবেই সেই দেশ-ও কালানুগ হয়। লোকগল্পের প্রধান আবেদন চরিত্রগুলি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত, তারা আমাদের হেঁশেল কি গোয়ালঘরের আনাচে-কানাচে বিচরণ করে, এবং, এমনকি, বলার ভঙ্গিটি পর্যন্ত প্রাদেশিক। ছাপার অক্ষরে তাকে ধরা কঠিন, যদিও যোগীন্দ্র সরকার এই দুঃসাধ্য ব্রতে বিরল সার্থকতা লাভ করেছিলেন।

আর পুরাণের বৈশিষ্ট্যই হলো যে চরিত্রগুলির নাম, কাল ইত্যাদি কিছুরই পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাঁরা আদি পুরুষ, তাঁরা ইতিহাস। এবং যদিও আধুনিক কালে অনেক কবি ও নাট্যকার প্রাচীন পুরাণকে আধুনিক ছদ্মবেশ পরাতে চেয়েছেন, তবু তাদের ভিত্তিভূমি সেই আদি পুরাণ যার রহস্য আমরা যুগে-যুগে উন্মোচনের চেষ্টা করি কিন্তু যার অর্থ কখনোই নিঃশেষিত কি চিরকালের জন্য ব্যাঘাত হয়ে যায় না।

কিন্তু এই অর্থের অশেষতা আর কবিতার অন্তহীন ব্যঞ্জনা এক জিনিষ নয়। যে-কোনো অনুবাদে, তা যতই অক্ষম হোক, পুরাণের আত্মা অবিকৃত থাকে। কখনো ভঙ্গি তো দূরের কথা, এমনকি ভাষা কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে না। মহাভারত যে-কোনো অনুবাদেই মহাভারত।

ভাষা যদি ব্যবধান সৃষ্টি না-করে, তবে কেন সর্বত্র মহাভারত সমাদৃত নয়? কেন গ্রীক পুরাণ আমাদের ঘরে-ঘরে প্রচলিত নয়? কেন বাইবেলের গল্পগুলি ঠাকুরমার ঝুলিতে স্থান পায়নি? তার কারণ স্পষ্ট। কোনো পুরাণকে কেবল গল্প কি নিছক সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করা দুষ্কর; তার অন্তর্নিহিত অর্থটি বিজ্ঞান কি দর্শন কি যুক্তির ভাষায় প্রকাশ করা যতই অসম্ভব হোক, তার অভিপ্রায় শ্রোতার টের পেতে দেরি হয় না: তার উদ্দেশ্য আমাদের জীবনধারা ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করা। পুরাণের প্রচার ধর্মান্তরীকরণ বিনা সম্ভব নয়।

জাপানে ভারতীয় পুরাণ

অবশ্য, এক বিশ্বাসের না-হলে যে পুরাণ একেবারই হৃদয়ংগম করা যাবে না, এমনও নয়। কোনো হিন্দুর পক্ষে ওল্ড টেস্টামেন্ট পাঠ করা এক স্মরণীয় শুধু নয়, উপকারী অভিজ্ঞতা। বিষাদসিন্ধু পাঠ করে তিনিও বিষণ্ণ হবেন। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা অন্য কোনো বিদেশী সাহিত্য পাঠের তুল্য কিনা সন্দেহ। অন্য দেশীয় পুরাণ পাঠে আমরা কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করি; শেক্সপীয়র কি গ্যেটে পাঠের মতো এই অভিজ্ঞতা দ্বিধাহীন কি অবিমিশ্র নয়।

অবশ্য এক জাতির পুরাণ অন্য জাতির গ্রহণ ও আত্তীকরণের দৃষ্টান্তও আছে। ভারতবর্ষের রামায়ণ-মহাভারত বালি ও সুমাত্রায় আজও অভিনীত হয়। জাতক-কাহিনী চীন ও জাপানে প্রচলিত। মহাভারতের অনেক কাহিনী বহু জাপানী নো-নাটকের আকর।

কিন্তু এগুলির সঙ্গে ধর্মের যোগ স্পষ্ট। ওল্ড টেস্টামেন্ট, যা আসলে ইহুদী জাতির 'ইতিহাস', তা এখন ইওরোপের, এবং পৃথিবীর যাবতীয় খ্রীস্টানের,

উত্তরাধিকার। এবং ভারতীয় পুরাণ বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিভূমি। যেটা সর্বাগ্রে লক্ষণীয় তা হচ্ছে সর্বত্রই এই পুরাণগুলি কোনো-না-কোনো অর্থে 'ইতিহাস' বলে স্বীকৃত। হাজার-হাজার বছর ধরে এগুলি কথিত হচ্ছে; সুতরাং দেশ-ও কালেভেদে এই কাহিনীগুলি কিছুটা পরিবর্তিত হতে বাধ্য। এমনকি ওল্ড টেস্টামেন্ট, যার পাঠ প্রাচীন পুরাণগুলির মধ্যে সবচেয়ে অবিকৃত রয়েছে, যে-গ্রন্থের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে মেসোরা-নামক এক বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায় সর্বদা সচেষ্ট ছিলো, তারও পরিবর্তন ঘটেছে। এত শত বর্ষের ব্যবধানে যদি বালিদ্বীপে রাম-সীতা ভাই বোনে পরিণত হন, তাতে বিস্ময়ের কারণ নেই। লোকসাহিত্যের প্রতিতুলনায় যেটা বিস্ময়জনক সেটা হলো সমুদ্র ও সময়ের এই ব্যবধান সত্ত্বেও ভারতবর্ষের স্মৃতি মুছে যায়নি, কাহিনীটিকে পরানো হয়নি স্থানীয় পোষাক. এবং এমনকি নামগুলি পর্যন্ত অবিকৃত আছে। সংস্কৃত মন্ত্রের যেমন জাপানী ভিক্ষুর বিশেষ কয়েকটি প্রবণতাবশত—এতগুলি শব্দ ব্যয় করতে হলো কারণ 'আড়ষ্টতা' ব্যবহারের সৎসাহস আমার নেই— উচ্চারণ বদলে গেছে, কিন্তু শব্দগুলি বদলায়নি, তেমন নো-নাটকে মহাভারতের ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানে মুনিপুত্রের নাম হয়ে গেছে 'একশৃঙ্গ', কিন্তু কাহিনীর কাঠামো কি ঘটনাস্থল অপরিবর্তিত।

তবে কি আমরা কোনোক্রমেই অন্য সংস্কৃতির পুরাণ গ্রহণে অক্ষম? সব পুরাণেই কি অভিপ্রায় কোনো একটি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন, কি কোনো একটিমাত্র দেবতা কি ঈশ্বরর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা? মহাভারতের উপমন্যু-কৃষ্ণ-সংবাদ, যাতে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, আর নল-দময়ন্তী উপাখ্যান কি একই ভাবে আমাদের প্রভাবিত করে? এক্ষেত্রে মানতেই হবে যে কীটস কবিতা বিষয়ে যা বলেছিলেন, পুরাণ বিষয়েও তা সত্য: যে পুরাণের অভিপ্রায় যত স্পষ্টত আমাদের বিশ্বাস পরিবর্তন, তার সার্বজনীন আবেদন তত কম।

এমন একদিন ছিলো যখন ডিয়োনিসসের উৎসবের অগ্রীকও যোগ দিতেন। ভারতীয় সওদাগরেরা পূজো দিয়ে আসতেন ব্যাবিলনীয় দেবস্থানে। মিশরীয় দেবী আইসিস গ্রীসেও আরাধ্যা ছিলেন। আজকে যেমন সারা সভ্যজগতের ভাষা বিজ্ঞান কি গণিত, একদিন তেমন ছিল পুরাণ।

অনেকের বিশ্বাস একদা-সার্বজনীন এই ভাষার চাবিকাঠি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। গণিত কি বিজ্ঞানের সাংকেতিক চিহ্নগুলি কি পরিভাষার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন, তাঁদের পক্ষে যেমন বিজ্ঞানবিষয়ক কোনো রচনার অর্থোদ্ধার সম্ভব নয়, তেমন আমাদেরও, যদি আমরা পুরাণভাষার অর্থ বুঝতে চাই, তবে তার সাংকেতিক পরিভাষার মর্ম বুঝতে হবে। এবং এই সংকেতের রহস্য উদ্ধার সম্ভব।

হিন্দুরমণী ও লেভি-স্ট্রাউস

এই মতবাদের সমর্থক ক্লোদ লেভি-স্ট্রাউস, যিনি বর্তমান পশ্চিম মহাদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম। কিন্তু এরকম পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও এই মতবাদকে নিছক

ছেলেমানুষি ছাড়া কিছুই বলা যায় না। এতকাল পুরাণ কথিত হচ্ছে; কবি ও নাট্যকার তাকে নব-নব রূপ দিচ্ছেন; মনস্তাত্ত্বিক পুরাণে খুঁজে পাচ্ছেন মানুষের অবচেতনার চিত্রকল্প; এঁরা কি কেউই পুরাণের কিছুই বোঝেননি? আমাদের কাছে কি পুরাণ এতকাল অর্থহীন ছিলো? নৃতত্ত্ববিদদের কাছে পুরাণ এক জটিল ধাঁধা যার নিয়মাবলী এখনো উদ্ঘাটিত হয়নি। লেভি-স্ট্রাউস স্বয়ং প্রস্তাব করেছেন: এই ধাঁধা সমাধানে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উদ্যোগী হোক; হাজার-হাজার কম্পিউটার পৃথিবীর যাবতীয় পুরাণের কাঠমো বিশ্লেষণ করুক; তবেই হবে এই ধাঁধার সমাধান এবং তখন চিরতরে প্রতিটি পুরাণের আসল অর্থটি কী তা নির্ধারিত হবে।

শ্রীযুক্ত লেভি-স্ট্রাউস স্বয়ং যে-কটি পুরাণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে সেই শুভদিন—যখন প্রত্যেকটি পুরাণের অর্থ নির্ভুলভাবে উদ্ঘাটিত হবে— আসন্ন ভাবতে ভীত হতে হয়। নৃতত্ত্ববিদরা এ-বিষয়ে এখনো মতি স্থির করেননি; সুতরাং সাহস করে এখনো পুরাণ বিষয়ে দুয়েকটি অর্বাচীন উক্তি সম্ভব।

প্রথম, পুরাণ যদিও অর্থবহ, তার অর্থ ঠিক গণিতের মতো নিরূপণ করা যায় না। সংখ্যা, কি পরিমাপ্য কোনো প্রাকৃতিক কি বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাংকেতিক বিবরণ নয় পুরাণ। যদি উনিশ শতকের ভাষাবিদেরা পুরাণকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপমা ভেবে ভুল করে থাকেন, এ-যুগের নৃতাত্ত্বিকেরা তাকে উপগাণিতিক ধাঁধা বলে ভুল করেছেন। পুরাণের অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার, যে কোনো হিন্দু রমণীর কাছে তা অতি প্রাঞ্জল।

পুরাণ দু জাতের। এক ধরণের পুরাণের উদ্দেশ্য এত স্পষ্ট যে সেগুলি নিয়ে এমনকি নৃতাত্ত্বিকেরাও মাথা ঘামান না। সমস্যা সেই জাতের পুরাণকে নিয়ে যার উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়, যা কোনো দেবতা কি জাতির মাহাত্ম্য প্রচার করে না, যার সঙ্গে অন্য পুরাণের কোনো বিরোধ নেই। খ্রীস্টের দেবত্ব মেনে নিলে ডিয়োনিসস কি কৃষ্ণকে আর মানা যায় না। গীতায় কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলে উপমন্যুপুরাণ ভ্রান্ত মনে হয়। কিন্তু নল-দময়ন্তী গল্পের অর্থ কী? 'মিডিয়া' কাহিনীর উপপাদ্য কী? এবং যেহেতু কাহিনীগুলির কোনো প্রত্যক্ষ অভিপ্রায় নেই, এগুলি আমরা সবাই মেনে নিতে পারি; আমাদের পূর্বতন জীবনপ্রণালীর প্রতি আনুগত্য ত্যাগ না-করেই জাতিধর্মনির্বিশেষে এগুলি সবাই গ্রহণ করতে পারেন।

এটা লক্ষণীয় পুরাণের সার্বজনীনতা হ্রাস পেল একেশ্বরবাদের উৎপত্তির পর; একজন হেরোডোটাস কি প্লিনি অন্যদেশীয় পুরাণসম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন শুধু নয়, শ্রদ্ধাবানও ছিলেন। কিন্তু খ্রীস্টধর্মপ্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে তার পূর্বতন যাবতীয় পুরাণকে নব্য বিশ্বাসীরা ভ্রান্ত শুধু নয়, অশুভ বলে ঘোষণা করেন; তাকে শ্রদ্ধা করা তো দূরের কথা, তার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত লুপ্ত করতে সচেষ্ট হলেন। মানবচৈতন্যের ইতিহাসে এটা এক সুউচ্চ বিভাজক। এরপর থেকে মানুষের কাছে মানবশরীর হয়ে গেল মুল্যহীন, এরপর তার যত চিন্তা, যত আর্তি সব অনুপস্থিত ঈশ্বরকে ঘিরে।

মানবকেন্দ্রিক

আর, প্রাক্-ঈশ্বরযুগের পুরাণ মানবকেন্দ্রিক। আদি পুরাণের সমস্ত বিস্ময়বোধ এই শরীরকে নিয়ে। জন্ম, প্রজনন, মল, স্বেদ, মাংস, পচন, মৃত্যু: এই সমস্ত ধাঁধার ব্যাখ্যা নয়, এই সমস্ত প্রগাঢ় রহস্যে বিস্ময়বোধ প্রাচীন পুরাণে নিহিত। মানুষের চৈতন্য শরীরকে নিয়ে এরকম বিভোর হয়ে থাকেনি আর কোনো সময়ে। পরে সে শবব্যবচ্ছেদ করেছে, রক্তসঞ্চালন আবিষ্কার করেছে, প্রস্তুত করেছে রোগহর ভেষজ। সে শরীরকে ব্যবহার করেছে, পরীক্ষা করেছে, উপভোগ করেছে। কিন্তু পুরাণকথক মানবশরীরের নিজস্ব রহস্যে মুগ্ধ। আত্মজ কে? নিজের সন্তান কি বিশেষরূপে ভক্ষ্য? বলিরূপে বধ্য? দেহ ও প্রতিকৃতির সম্পর্ক কী? স্বেদ ও মল কী? প্রজননে পুরুষের শুক্রই কি প্রধান? নারী কি ক্ষেত্রমাত্র? শনি ও শরীরে সম্পর্ক কী? এই সকল 'প্রশ্নে'র উত্তর নয়, এই সকল রহস্যের অভিব্যক্তি ঘটে পুরাণে।

গ্রীক কবি জেনোফেনিস পুরাণকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে এই সত্য ধরে ফেলেছিলেন যে পুরাণ মানবকেন্দ্রিক। তিনি লিখেছিলেন যে পুরাণকার হোমর ও হেসিয়ড 'দেবতাদের যে-সব আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ, যেমন লাম্পট্য ও চৌর্যবৃত্তি, বর্ণনা করেন তা মনুষ্যকৃত হলেও নিন্দনীয় হতো। মানুষ মনে করে বুঝি দেবতাদের আকৃতি ও আচরণ মানুষেরই ন্যায়। কিন্তু যদি বৃষ কিংবা সিংহ কিংবা অশ্বের হাত থাকত, এবং তাদের পক্ষে যদি সম্ভব হতো ছবি আঁকা, তবে অশ্ব দেবতারূপে অঙ্কন করত এক বৃহদাকার অশ্ব ও বৃষ মূর্তি গড়ত এক মহান বৃষভের। কিন্তু প্রকৃত দেবতা, যিনি ঈশ্বর, তিনি এক, তিনি অভেদ্য, তিনি মানুষের মতো নন আকারে, চিন্তায়। ... তিনি সব কিছুই দেখেন, শোনেন ও বোঝেন, কোনো আয়াসবিনাই, কেবলমাত্র ইচ্ছাবলে, চালিত করেন সারা জগৎ। তিনিই স্নায়ু এবং তিনিই সর্বত্রই আছেন। তাঁকে (ধূর্ত জীয়ুস-এর মতো) এখানে-ওখানে ছোটাছুটি করতে হয় না।'

যেদিন মানুষ এই ঈশ্বরকে পেয়েছিল, সেদিন সে নির্দ্বিধায় ত্যাগ করেছিল পুরাণ ও পুরাণোক্ত দেবতাদের, যারা আসলে তো মানুষেরই উপমেয়। কিন্তু এখন চাকা আবার ঘুরে এসেছে। ঈশ্বরহীন জগতে মানুষ আবার একাকী। এখন পুনর্বার তার একমাত্র আশ্রয় সে নিজে, তার মানবশরীর, তার মানবচৈতন্য। সে আবার তার নিজের রহস্যে মুগ্ধ। এখন সময় এসেছে পুরাণের পুনর্মূল্যায়নের এবং এই পুনর্মূল্যায়নে আমরাও অংশগ্রহণ করতে পারি। সত্য, আমাদের হাতের কাছে কম্পিউটার নেই। দেশবিদেশের প্রচলিত অপ্রচলিত পুরাণ সংগ্রহের উপযোগী অর্থ ও সংগঠন আমাদের নেই। আমাদের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বৈদেশিক পুরাণ তো দূরের কথা, স্বদেশীয় পুরাণের বিশ্লেষণে উৎসাহী হবেন, এমন স্বপ্ন পরম আশাবাদীও দেখেন না। কিন্তু অপরদিকে আমাদের এমন এক সুবিধে আছে যার তুলনায় অন্য সব অসুবিধে নগণ্য· আমরা এখনো পুরাণের জগতে বাস করছি; ভারতবর্ষে এখনো পুরাণ সৃষ্ট হয়; নতুন-নতুন দেব-দেবীর সৃষ্টি হচ্ছে; এখনো কোনো উৎসাহী যুবক

পুরাণের জন্ম ও প্রচারের রহস্য নিজের ঘরে বসে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

চতুর্দিকে চিন্তার, আলোচনার, গবেষণার কত পরমাশ্চর্য বিষয় ছড়ানো আছে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। প্রতি গ্রামের জলাশয়, দেবস্থান, বটবৃক্ষ, প্রতি শ্মশান, মন্দির তো বটেই, এমনকি প্রস্তর ও শিলাখণ্ড, পুরাণের আকর। কত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে অলিখিত আছে, ভাবতে রোমাঞ্চ হয়। এরকমই একটি বিষয় টুনটুনির বই। এই গল্পগুলির শ্রেণীবিভাগ, অন্যদেশের গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্য, এদের উৎস ও বিস্তার, এদের গড়ন ও তাৎপর্য— এসব বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য। বর্তমান প্রাবন্ধিকের এর জন্য প্রয়োজনীয় পাণ্ডিত্য নেই, সেহেতু উপস্থিত কেবল একটি রহস্যের আলোচনায় নিজেকে সীমিত রাখব।

নিগূঢ় অর্থময়

রহস্যটি 'উকুনে বুড়ি' নামক গল্প ঘিরে। গড়নে 'উকুনে বুড়ি' অন্য যে-কোনো লোকগল্পের মতো। অথচ তাৎপর্যে এটি যে-কোনো পুরাণের তুল্য। অনেক সময় যেমন লোকগল্পে পুরাণের কাঠামো ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পুরাণধৃত অর্থটি যায় হারিয়ে, এখানে লোকগল্পের ছকটি নেয়া হয়েছে, কিন্তু ছকটি হয়ে উঠেছে নিগূঢ় অর্থময়।

গড়নটি আলোচনার যোগ্য। এক উকুনে বুড়ি ছিলো যাকে তার স্বামী তাড়িয়ে দেয়। এক বক তাকে আশ্রয় দিল। একদিন বুড়ি কড়ার মধ্যে পড়ে, সিদ্ধ হয়ে, মারা গেল। খুব দুঃখ হলো বকের, সে দাঁড়িয়ে রইল নদীতীরে, মৌনী, মৎস্যশিকারে উদাসীন। তাই দেখে নদী জানতে চাইল তার কী হয়েছে ? মাছের প্রতি তার এই স্বভাববিরুদ্ধ বৈরাগ্য কেন ? অনেক পীড়াপীড়ির পর বক নদীকে সাবধান করে দিল যে নদী যদি কাহিনীটি শোনে তাহলে তার সব জল তৎক্ষণাৎ ফেনা হয়ে যাবে। এরপরের অংশ লোকগল্পের ভঙ্গিতে ছাড়া বলা যায় না:

নদী বল্লে, "হয় হবে. তুই বল।"

তখন বক বল্লে, "উকুনে বুড়ি পুড়ে মোলো, বক সাতদিন উপোস রইল।"

অমনি ফ্যান ফ্যান করে দেখতে দেখতে নদীর জল ফেনিয়ে সাদা হয়ে গেল।

সেই নদীতে এক হাতি রোজ জল খেতে আসে। সেদিন সে জল খেতে এসে দেখে, এ কি কাণ্ড হয়ে আছে!

হাতি বল্লে, "নদী তোর এ কি হলো ? তোর জল কবে ফেনা হয়ে গেল ?"

নদী বল্লে, "তা যদি বলি, তবে কিন্তু তোর লেজটি খসে পড়ে যাবে।"

হাতি বল্লে, "যায় যাবে, তুই বল্।"

তখন নদী বল্লে,—

"উকুনে বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল

নদীর জল ফেনিয়ে গেল।”

অমনি ধপাস্ করে হাতির লেজটা পড়ে গেল।

তারপর হাতি গাছতলা দিয়ে যাচ্ছে; গাছ তাকে দেখে বল্লে,

“বাঃ রে, তোর এ কি হলো; তোর লেজ কোথায় গেল?”

হাতি বল্লে, “তা যদি বলি, তবে কিন্তু তোর পাতাগুলি সব এক্ষুনি ঝরে পড়বে।”

গাছ বল্লে, “পড়ে পড়ুক, তুই বল্।”

তখন হাতি বল্লে—

“উকুনে বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল।”

অমনি ঝরঝর করে গাছের সবগুলি পাতা ঝরে পড়ে গেল।

এইভাবে ঘুঘুর একটা চোখ কানা হয়ে গেল, রাখালের লাঠি আটকে রইল তার হাতে, রাজবাড়ির দাসীর হাতে আটকে গেল কুলো, রানীর হাতে থাল, রাজার পেছনে পিঁড়ি আর রাজসভাসদেরা আটকে গেলেন যে যাঁর বসার জায়গায়। এই পর্যন্ত এসে গল্পকথক ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তাঁর যেন উদ্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে যায়। গল্পটির সমাপ্তি কেমন যেন অসংগত, এই অলৌকিক ঘটনাবলীর পর অত্যন্ত প্রাত্যহিক। তারপর? ‘ভাগ্যিস্ সেই দেশে এক খুব বুদ্ধিমান নাপিত ছিলো, নইলে মুশকিলই হয়েছিল আর কি। নাপিত এসে বললে, “শীগগির ছুতোর ডাক”।

‘তখন ছুতোর এসে পিঁড়ি কেটে রাজামশাইকে ছাড়ালে আর তক্তপোশ কেটে সভার লোকজনদের ছাড়ালে। একটু একটু কাঠ তবু সকলের গায়ে লেগে ছিলো, সেটুকু চেঁছে তুলে দিলে।

‘রানীর হাতের থালা, দাসীর হাতের কুলো আর রাখালের হাতের লাঠি কেটে ফেলে দেওয়া হলো’।

এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম-বহির্ভূত কাণ্ড—তারপর এরকম বাস্তববাদী সমাধান আমাদের অসংগত ঠেকে। লোকগল্পে নাপিত সর্বদাই বুদ্ধিমান; কিন্তু তার এখানে আমদানি নিষ্প্রয়োজন। ছুতোর এমনিতেই আসতে পারত; ছুতোরের পরামর্শটা এমন কিছু অভাবনীয় নয় যে তা দেওয়ার জন্য মহাবুদ্ধিমান নাপিতের প্রয়োজন।

নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু লোকগল্পের প্রথাসিদ্ধ। লোকগল্পে প্রত্যেকটি ধাপ ভাগ করা; গল্পের প্রত্যেকটি দিকপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনসূচক একটি চিহ্ন গল্পকথক ব্যবহার করেন। এটি একটি মুদ্রা; গল্পকথকের ঝুলিতে এরকম অনেকগুলি মুদ্রা আছে, যেগুলি নানান অন্বয়ে, নানা বিচিত্র ক্রমে, ব্যবহার করে তিনি নতুন-নতুন গল্প সৃষ্টি করেন। পরামর্শদান কাহিনীটিতে একটি বিশেষ ঘটনা, লোকগল্পের রীতিই

হলো এই, যে এমন বিশেষ একটি মুহূর্তের জন্য বিশিষ্ট একটি মুদ্রা ব্যবহার করতেই হবে।

চাকার আবর্তন

শুধু নাপিতের আগমন লোকগল্পের রীতি অনুযায়ী, এমন নয়। পুরো গল্পের ধাঁচ ও দর্শনও, আপাতদৃষ্টিতে, টুনটুনির বইয়ের অন্যান্য গল্পগুলির অনুরূপ। লেজহীন হাতিকে দেখে গাছ একটু হয়তো হেসেছিল, কিংবা গাছের পাতা ঝরে যাওয়ায় সমবেদনার চেয়ে ঘুঘুর কৌতূহলই হয়েছিল বেশি; তাই বলে এমন শাস্তি! কাহিনীটি গড়নেও অনেকটা 'টুনটুনি ও নাপিতের কথা'র তুল্য। দুই গল্পে একই ঘটনা বারবার ঘটে: টুনটুনি প্রার্থী হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘোরে, কিন্তু তার যদিও অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, প্রত্যেকের কাছে তার প্রার্থনা মূলত এক, এবং অন্যদের প্রতিক্রিয়াও একই জাতের। উকুনে বুড়িতেও নদীর, হাতির গাছের ইত্যাদির একই প্রকারের পরিবর্তন ঘটে। অবশ্য টুনটুনি যে-ক্রম অনুসারে রাজা থেকে শুরু করে অবশেষে মশার সহায়তাপ্রার্থী হয় তার মধ্যে আমরা একটি অগ্রগতি লক্ষ করি; না; অগ্রগতি ততটা নয় যতটা একটি চাকার পূর্ণ আবর্তন, কারণ ইঁদুর থেকে হাতি পর্যন্ত ধাপে-ধাপে উঠে, টুনটুনিকে অবশেষে ক্ষুদ্র মশার দ্বারস্থ হতে হয়; (লক্ষণীয়, গল্পকথকের কল্পনায় হাতি সাগরের চেয়েও বৃহত্তর শক্তি!) এবং মশা পর্যন্ত এসে আবার চাকাটা উল্টোদিকে ঘুরে যায়; অবশেষে রাজা নাপিতকে শিরশ্ছেদের হুকুম দিলে. নাপিত হাত জোড় করে বলে, "রক্ষে কর টুনি দাদা! এস তোমার ফোঁড়া কাটি!"

'তারপর টুনটুনির ফোঁড়া সেরে গেল, আর সে ভারি খুশি হয়ে আবার গিয়ে নাচতে আর গাইতে লাগল, "টুনটুনি টুন্ টুন্ টুন্! ধেই ধেই!"

এরপর টুনির জীবন সুখে-শান্তিতে কেটে যাবে, এই রকম অনুমান আমরা করতে পারি। বস্তুত 'টুনটুনি ও নাপিতের কথা' লোকসাহিত্যের একটি— এই শব্দটি এক্ষেত্রে যতই অপ্রযোজ্য হোক. ব্যবহার করতেই হয়— ক্ল্যাসিক; লোকগল্পের কাঠামো বিশ্লেষণ করতে গেলে এর চেয়ে ছিমছাম, এর চেয়ে বাহুল্যবিহীন দৃষ্টান্ত সহজে চোখে পড়ে না। একটি সংকট উপস্থিত হয়েছিল টুনির জীবনে; সেই থেকে একটি ঘটনাচক্রের আবর্তন শুরু হলো, যা পুনরাবর্তিত হয়ে আবার ফিরে এলো সেই আদি সংকটে, এবং যার অবসানে গল্পটির শেষ। এই গল্পটি সুসমঞ্জস আবিভাজ্য। পান্তাবুড়ির গল্পেরও এই গুণটি বর্তমান। একটি চোর পান্তা খেয়ে যেত; রাজার কাছে যাবার পথে বুড়ির বেল, শিঙিমাছ ইত্যাদির সঙ্গে দেখা, যাদের সহায়তায় বুড়ির অভীষ্ট সিদ্ধ হলো।

কিন্তু, অন্য গল্পগুলির কাঠামোর সঙ্গে আপাতসাদৃশ্য সত্ত্বেও 'উকুনে বুড়ি'র প্রকৃতি ভিন্ন। উকুনে বুড়ির ঘটনাপরম্পরাকে কিছুতেই একটি চক্র বলা যায় না। বরং তা তরঙ্গের মতো, কেন্দ্র থেকে ক্রমশ দূরে চলে যায়। বুড়িটি কড়ার মধ্যে পড়ে গিয়ে মারা গেল; সেখানেই তার শেষ; সেই আদি ঘটনায় গল্পটি আর ফিরে

এলো না। রুশ মনীষী পোপোভ লক্ষ করেছিলেন যে লোকগল্পের মূল আকৃতিকে একটি বলয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়: সংকট, ঘটনাচক্র, সংকটাবসান। একটি গল্প ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা যায় বলয়ের সঙ্গে বলয় যোগ করে, কিন্তু লোকগল্পের ধর্মই হলো সংকট উপস্থিত হলে তার নিষ্পত্তিও হতেই হবে। কিন্তু এখানে নদী যে সাদা হয়ে গেল, হাতি হারল লেজ, গাছের ঝরে গেল পাতা, ঘুঘু হলো কানা, এদের পরিণতি কী হলো সে-বিষয়ে গল্পকথক একেবারেই উদাসীন।

সত্য, রাজা পিঁড়ি থেকে মুক্তি পেলেন। বুড়ির মৃত্যুতে যে-তরঙ্গমালার উৎপত্তি স্পষ্টতই মানুষের জগতে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্র বদলে গেল। নদী, পশু ও গাছের বুড়ির মৃত্যুকাহিনী শ্রবণে যে পরিবর্তন ঘটে, রাখাল থেকে শুরু করে রাজসভাসদগণের সেই রকম শারীরিক কোনো পরিবর্তন ঘটে না। মানব পাত্রপাত্রীর কোনো অঙ্গহানি হয় না, তাদের শরীরের সঙ্গে অন্য কিছু যুক্ত হয়। কাহিনীশ্রবণে, দৃশ্যত, তাদের এইটুকুই পরিবর্তন ঘটে, সেহেতু তাদের সংকটমুক্তিও সম্ভব, যদিও তা কিঞ্চিৎ কষ্টকর ; কিছু কাঠ শেষ পর্যন্ত তাদের গায়ে লেগেই ছিলো, র‍্যাঁদা ঘষে তা তুলতে হলো।

'টুনটুনির ও নাপিতের কথা'র প্রতিতুলনায় এই গল্পটির পরিণতি মনে হয় অসম্পূর্ণ। কেন গল্পটি বলা হলো সে-বিষয়ে আমাদের সংশয় থেকে যায়। এই ঘটনাপরম্পরা মধ্যে আমরা লোকগল্পের প্রথাসিদ্ধ কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পারি না; মনে হয় যেন লোকগল্পের পক্ষেও 'উকুনে বুড়ি' বড়ো বেশি আধাঢ়ে ও অসংলগ্ন। অথচ, এই গল্পটি কেন বলা হতো? কেন স্থান পেল এই সংগ্রহে? নিশ্চয় এর কোনো আবেদন আছে। সেটা যদি লোকগল্পোচিত না-হয়, তবে তা কি জাতের আরেকবার ভেবে দেখতে হয়। এই গল্পের কোনো অর্থ থাকলেও থাকতে পারে এই চিন্তা উদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে গল্পটিতে বর্ণিত ঘটনাপরম্পরার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। সে-বৈশিষ্ট্যগুলি লোকসাহিত্যের নয়, সেগুলি পুরাণের।

নদীর দিব্যদৃষ্টিলাভ

পুরাণে যেমন বারে-বারে কোনো একটি বিশেষ রহস্যের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, নল-দয়মন্তী পুরাণে যেমন পুরাণকার বারে-বারে শরীব-অবয়ব-প্রতিকৃতি-শরীরের মল-শনি এই গোত্রীয় রহস্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, 'উকুনে বুড়ি' গল্পটিতেও কথক বারে বারে, প্রায় লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেয়ার মতো সানুনয়ে, একটি মূল পরিবর্তনের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। প্রথমে যদিও মনে হয় মানব জগতে যে-পরিবর্তন ঘটে তা প্রাকৃতিক জগতের পরিবর্তন থেকে ভিন্ন, বুড়ির মৃত্যুকাহিনী শ্রবণে উভয় জগতেই এক মৌল পরিবর্তন ঘটে। কাহিনীটি শ্রবণে প্রত্যেকের বাহ্যিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এক মানসিক পরিবর্তনও লক্ষ করি। নদী কেবল ফেনময় ও সাদা হয়ে যায় না; কাহিনীটি শোনার আগে তার কথায় ছিলো ব্যঙ্গের সুর, সে ছিলো অবিশ্বাসী। তাকে সাবধান

করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু সে বিশ্বাস করেনি যে কোনো গল্প শোনার ফলে এমন আশ্চর্য পরিবর্তন সম্ভব। অথচ যে-মুহূর্তে সে গল্পটি শুনল, সে শুধু বাহ্যত বদলে গেল তাই নয়, সে পেল এক নতুন অন্তর্দৃষ্টি। পাছে আমরা এই মৌল পরিবর্তন লক্ষ না-করি সেই জন্যই মানবপ্রতিক্রিয়ার ভিন্নতা; ঐ ভিন্নতাই আরো তাৎপর্যময়, আরো প্রকট করে তোলে এই পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত ঐক্য। নদী কিংবা হাতি কিংবা রাখালের আগের জীবন ছিলো স্বাভাবিক, প্রাত্যহিক; কিন্তু যে-মুহূর্তে তারা অলৌকিকের দ্বারা স্পৃষ্ট হলো, সেই মুহূর্তে তারা পেল বিদ্যদৃষ্টি, তারা হয়ে গেল ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা। আমরা প্রাত্যহিক জগতের মানুষ; এই কাহিনী শুনে আমাদেরও জাগতে পারে অবিশ্বাস। কেউ আমাদের শতবার সাবধান করে দিলেও আমরা বিশ্বাস করব না; কিন্তু কে জানে সেই ঘটনাতরঙ্গ যা বুড়ির মৃত্যুতে উত্থিত হয়েছিল তা এখনো বহমান কিনা? কালকে যদি কোনো খঞ্জের সঙ্গে দেখা হয়, কী নিশ্চিতি আছে যে সে কোনো সাধারণ খঞ্জ? তার পা হয়তো রেলে কাটা পড়েনি, সে হয়তো গতকালও দিব্যি সুস্থ ছিলো, সে কেবল হয়তো কোনো কানাকে দেখে জানতে চেয়েছিল তার অন্ধতার ইতিহাস? এবং আমিও যদি তাকে প্রশ্ন করি, কে জানে আমরা হাত খসে পড়বে কিনা? হাত খসে পড়বার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় সত্যি কি জগতে অলৌকিকের স্থান আছে। অথচ যখন সেই দিব্যদৃষ্টির উন্মেষ হয়, তখন বড়ো দেরি হয়ে গেছে; আশ্চর্য এই যে এই দিব্যদৃষ্টি, এই জ্ঞান, প্রত্যেকে কেবল নিজের জন্য অর্জন করতে পারে; অন্যকে সহস্রবার সাবধান করেও লাভ নেই।

প্রথমে যেটা মনে হয়েছিল গল্পের জীবনদর্শন, পুনর্বিবেচনায় মনে হয় তার উল্টোটাই যেন ইঙ্গিত করা হচ্ছে। 'বুড়ি সেদ্ধ হয়ে মারা গেল,' এই ঘটনাটিকে গল্পে মোটেই উপেক্ষা করা হচ্ছে না। লোকসাহিত্যের মতো বুড়িকে গল্পের শেষে কোনো জাদুকর জীয়নকাঠি ছুঁইয়ে বাঁচিয়ে দিলেন না বটে, কিন্তু ঐ মৃত্যুটিই গল্পের কেন্দ্র বিন্দু। জাদুবিদ্যা, ভোজবাজি, এসব প্রাত্যহিক জগতেরই ছদ্মবেশী অংশ; এদের সঙ্গে অলৌকিকের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রাকৃতিক নিয়মের খাড়া মূর্তিটিকে উল্টে মাথার উপর দাঁড় করিয়ে দেয়ার নামই ভোজবাজি। ভারি জিনিস মাধ্যাকর্ষণবশত নিম্নাভিমুখী: তা যদি হঠাৎ উপর দিকে ওঠে সেটাই জাদু। কিন্তু অলৌকিকের সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মের কোনো যোগ নেই, বিরুদ্ধতাও নেই। এখানে বুড়ির মৃত্যু বড়ো রহস্যময়, কিন্তু সে রহস্যটা ম্যাজিকের হাতসাফাই নয়। বুড়ি মারা গেল, এবং যদিও গল্পের বৃত্ত ঘুরে আর তার কাছে ফিরে এলো না, বুড়িকে ভুলে যাওয়া হলো না। কোনো মৃত্যু, তা যত নগণ্য ব্যক্তিরই হোক, এমনকি উকুনে বুড়ির মৃত্যুও, কোনো যতি নয়, বরং তা এক অপ্রতিরোধ্য তরঙ্গমালার শুরু। কেবল আমরা যতক্ষণ না সেই তরঙ্গের দ্বারা স্বয়ং সিক্ত হচ্ছি ততক্ষণ আমাদের দৃষ্টিকে তা এড়িয়ে যায়।

লক্ষণীয়, বুড়ির মৃত্যুতে যে-পবিবর্তনমালাব সূত্রপাত তা বককে স্পর্শ করে না। কারণ স্পষ্ট। সারা গল্পটিতে একমাত্র বক বুড়ির জীবৎকালে দয়ার্দ্র ও মৃত্যুতে

শোকগ্রস্ত হয়েছিল। বকের শোক লোকসাহিত্যের পক্ষে বড়োই অস্বাভাবিক। লোকসাহিত্যের জগতে যে কান্নাকাটির স্থান নেই এমন নয়, কিন্তু এমনকি দুঃখও সেখানে একটি 'সংকট', কোনো ঘটনাচক্রের নিম্ন বিন্দু, যা ঘুরে এলে সংকট অতিক্রান্ত হয়। 'বোকা জোলা আর শিয়ালের কথা' পাঠক স্মরণ করুন। জোলার মার জ্বর হলো; জোলা যেমন গরম কাস্তের চিকিৎসা করেছিল, মাকেও তেমন সে জলে চুবিয়ে রাখল 'সে বেচারী যতই ছটফট করে, জোলা ততই আরো চেপে ধরে, আর বলে, "রোস, এই ত জ্বর সারছে।"

'তারপর যখন বুড়ি আর নড়ছে না চড়ছে না, তখন তাকে তুলে দেখে সে মরে গেছে। তখন জোলা চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। তিন দিন কিছু খেল না, পুকুর পাড় থেকে ঘরেও গেল না।

'এক শিয়াল সেই জোলার বন্ধু ছিলো। সে জোলাকে কাঁদতে দেখে এসে বল্লে, "বন্ধু, তুমি কেঁদ না, তোমাকে রাজার মেয়ে বিয়ে করাব।"

'শুনে জোলা চোখ মুছে ঘরে গেল। তারপর থেকে সে রোজ শিয়ালকে বলে, "কৈ বন্ধু, সেই যে বলেছিলে?"

এখানে লোকসাহিত্যের শ্রোতা জোলার নির্বুদ্ধিতায় হাসবেন কিন্তু তাকে হৃদয়হীন বলে তিরস্কার করবেন না। চেঁচিয়ে কেঁদে, তিনদিন না-খেয়ে থাকা লোকসাহিত্যের পক্ষে যথেষ্ট; সেহেতু বকের শোকের গভীরতা আমরা লক্ষ করতে বাধ্য হই। তার শোকের কথা সে কাউকে জানাতে চায় না; তার শোক কোনো অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নয়; তার শোকের কৈবল্য লোকসাহিত্যে অনন্য। অন্যেরা কেউ অপরের দুঃখবিষয়ে কৌতূহলী, কারো কাছে তা কৌতুকের কারণ। কেবল বক অনাত্মীয় বুড়ির মৃত্যুকে নিজের দুঃখ করে নেয়। সেহেতু বাহ্যিক কোনো পরিবর্তনবিনাই সে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে, দেখতে পায় এই রহস্যলহরী কেমন নদীর জীবনকে বদলে দেবে, হাতি, ঘুঘু, রাখাল, রাজা এবং আরো কত জীবন এর দ্বারা পরিবর্তিত হবে। এটা পাঠ করে আমাদের জীবনও পরিবর্তিত হয়; জীবন পরিবর্তিত না-হোক, জীবনের ও মৃত্যুর, কোনো-কোনো রহস্যে আমরা মুগ্ধ হই, কোনো-কোনো যুক্তি-অতীত সম্ভাবনা আমাদের মনে উঁকি দেয়। এই সম্ভাবনাগুলিকে, নাতিকে গল্প শোনাতে-শোনাতে, কত না অবহেলিত বৃদ্ধার অবচেতনায় ঝিলিক তুলে গেছে, তাঁদের জীবনকে অর্থহীনতা থেকে করেছে উদ্ধার!

জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

একজনের মৃত্যুর আঘাত সামলে ওঠার আগেই অন্য জন মারা গেলেন; শুধুমাত্র মৃত্যুর তারিখে তাঁরা সন্নিকট; নিতান্ত অর্থহীন অযৌক্তিক এই সংযোগ। আর মৃত্যুতে কি তাঁরা ভিন্ন নন? অকালমৃত্যু দুজনেরই, এবং কেউই সম্ভ্রান্ত, তৃপ্ত গৃহস্থের মতো সম্পত্তির নিপুণ ব্যবস্থা করে, শুভাকাঙ্ক্ষী স্বজনবর্গকে পরামর্শ ও সন্তপ্ত আত্মীয়গণকে শোকপ্রশমনের উপদেশ দিতে-দিতে পরলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভ করেননি। এঁদের মৃত্যু কোনো শীতল প্রলেপ, শান্ত সমাধি, পরম সমাধান নয়; এ হলো মুদ্গরের আঘাত, উৎপাটন, বিচ্ছেদ, যতি। কিন্তু এই নিষ্ঠুর মৃত্যু যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপরিকল্পিত। জৈন তীর্থংকর যেমন খাদ্য বর্জন করে নিজকে ধীরে-ধীরে শুকিয়ে মারেন, তেমনি যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অন্ত্রে ধীরে-ধীরে বিষ সঞ্চয় করে নিজেকে হত্যা করলেন। আর জীবনানন্দের মৃত্যু হলো অকস্মাৎ; এটুকু অন্তত বলা যাক যে এ-মৃত্যু এমনকি তিনিও আকাঙ্ক্ষা করেননি। দলিত উদ্ভিদের মতো তিনি শুধু আঘাত গ্রহণ করলেন; ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে মৃত্যু যখন তাঁকে আঘাত করল, এই নিতান্ত নিরুদ্যম বোধসর্বস্ব কোমল মানুষটি সে-আঘাত সহ্য করলেন শুধু। জীবনানন্দ সারা জীবন পালন করে গেলেন যেন কোনো-এক নিরভিমান বিধবার ব্রত। শুচিবায়ুগ্রস্ত সমাজের অত্যাচার, দারিদ্র্য, পাঠকসমাজের উপেক্ষা, সব-কিছু শুধু সহ্য করে গেলেন; অথচ কোথাও একবিন্দু তিক্ততা রেখে গেলেন না। কোনোদিন কোনো তর্কে প্রবৃত্ত হননি, বিদ্বেষ করেননি কাউকে, শুনেছি ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মঠবাসী সন্ন্যাসীর চেয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিতের চাইতে সুদূর। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন যেন এক তুমুল অগ্নিকাণ্ড। লোকসংসার দগ্ধ করে যখন আর-কিছুই অবশিষ্ট রইল না তখন তিনি নিজেকে আহুতি দিলেন।

একজন এমন লাজুক, সর্বদাই বিনয়ে ও আত্মসংশয়ে এমন আনত, সামাজিক আলাপে এমনি অক্ষম যে পরম হিতৈষী ভক্তের কাছেও তাঁর সঙ্গ ছিল শ্বাসরোধকর। আর অন্যজন অজস্র কথা বলতেন, অনায়াসে নিষ্ঠুর হতে পারতেন, সকলকে অবাক করে দিতেন তাঁর সরল নির্লজ্জতায়। আগন্তুকের আক্রমণে পশু কিংবা ত্রস্ত শিশুর মতো নিজেকে আত্মগোপনের চেষ্টা করতেন জীবনানন্দ দাশ, আর বালকের মতো নির্ভয় ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আকৃতিতেও ভিন্ন ছিলেন তাঁরা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ের রং কালো,

বাঙালীর পক্ষে তার দৈর্ঘ্য লক্ষণীয়, বড়ো বড়ো পা জীর্ণ জুতোয় আবৃত। ঘরে ঢুকতেন তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো হুড়মুড় করে। কেউ যে এমন ত্বরিতগতিতে এত কিছু এমন অনায়াসে (এবং নিজের অজ্ঞাতসারে) সংঘটিত করতে পারেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ ও নির্গমন না দেখে থাকলে তা নাকি কল্পনা করা যায় না। আর জীবনানন্দের ভঙ্গি ছিলো ভিতু, বড়ো-বড়ো চোখ সর্বদা বিস্ময়ে বিস্ফারিত; প্রশস্ত কিন্তু অলস তাঁর খর্বকায় শরীর।

ভিন্নতার তালিকা দীর্ঘতর করা সহজ কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। একজন শেষ জীবনে সাহিত্যকে রাজনীতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করলেন, অন্যজন রাজনীতিকে সাহিত্যের। জীবনানন্দের অন্তিম কবিতাগুলিতে সমকালীন ঘটনার যত উল্লেখ আছে, প্রথম দিকের কবিতায় তার শতাংশও নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র শেষ জীবনে একজন সাহিত্যিককে তাঁর উপন্যাসের নায়ক করলেন। কিন্তু এ-সাহিত্যিক যে-কোনো গণপ্রচারসভায় সম্পাদককেও টেক্কা দিতে পারেন, তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি এমন টনটনে, তাঁর চিন্তা এমন বুলিসর্বস্ব। আর জীবনানন্দের রাজনীতি এক বায়বীয় লোকে সংঘটিত হয়; "স্তালিন-নেহেরু-ব্লক" মানুষ নন, প্রতীকও নন, শুধুমাত্র শব্দবিশেষ; এ-কালের রাস্তায় হাঁটলে এই সব সাইনবোর্ড চোখে পড়ে কিন্তু অনুপম ত্রিবেদী অথবা জীবনানন্দের হৃদয়ে এরা অর্ধসত্যের অধিক স্বীকৃতি পায় না।

কিন্তু এই নামগুলি ছাড়াও আরো আছে। হয়তো স্তালিন-নেহরু শুধু নাম, "রিবংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়" তাঁর হৃদয়ে সাড়া তোলে। শুধু সাড়া নয়; শেষ বয়সে এইগুলিই জীবনানন্দের প্রধান ভাবনা হয়ে উঠল; যে-কবি অলস গ্রাম্য ভাঁড়ের মতো সব-কিছু ভুলে মদের পাত্রে, ঘুমে, মৃত্যুতে শান্তি খুঁজেছিলেন, তিনি 'বাংলার তেরশ চুয়ান্ন সালে' এসে থমকে দাঁড়ালেন, প্রত্যক্ষ করলেন রক্তাক্ত পৃথিবীকে, উপায় খুঁজলেন পরিত্রাণের।

অবশ্য জীবনানন্দ যৌবনেও অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁর কবিতা প্রথম থেকেই এমন এক তীব্র বেদনায় ভরা যার নাম আমরা জানি না, শুধু যখন মাঝে-মাঝে "উটের গ্রীবার মতো" আমাদের মনের জানালায় হানা দেয় তখন তার প্রভাব অনুভব করি। সেই পরম বিষণ্ণ উট আবির্ভূত হলে দেহধারণ অসম্ভব হয়ে ওঠে। সে-বিষাদে কাতর হয়ে গ্রাম্য কবি মদের পাত্রে আরাম চেয়েছিলেন, ব্যথায় অবশ হয়ে লাশকাটা ঘরে শান্তি খুঁজেছিল আর-একজন, আর যখন জৈব প্রেরণা এবং প্রবৃত্তির চাইতে চৈতন্যের ভার বেশি হয়ে গেল, যখন "জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক" বেসামাল হয়ে উঠল, তখন এমনকি চতুর অনুপম ত্রিবেদীরও মৃত্যু ছাড়া গতি রইল না। আর যে কবি অনেক "রাজনীতি রুগ্ন নীতি মারী" প্রত্যক্ষ করেও বিশ্বাস হারাননি কারণ তিনি বুদ্ধকেও স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তিনি ১৩৫৪ সালে ঠেকে যেতে চান একই বেদনায় কাতর হয়ে। কবিমাত্রেই দূরদ্রষ্টা ও কোমলচিত্ত; তাই, কোনো বিস্মৃত অতীতে কিংবা দূর ভবিষ্যতে, দূরদেশের কোনো অচেনা ব্যক্তিও যদি আঘাত পান বা পেয়ে থাকেন তবে তিনিও আহত হবেন। বেঁচে থাকে তারা "যারা কিছুই সৃষ্টি

করেনি", প্রতিদিন "তাদের অবিকার মন শৃঙ্খলায় জেগে ওঠে কাজে।" বেঁচে থাকে নীচ প্রাণী, জেগে থাকে পেঁচা। অথচ আশ্চর্য এই যে অনুপম ত্রিবেদীদেরই শুধু মৃত্যু ঘটে; বিস্মৃতিপ্রার্থী কবির চেতনার জ্বালা জুড়োয় না, হৃদয়হীন প্রাণীদের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বেঁচেও থাকেন।

চল্লিশ বছর বয়সে জীবনানন্দ উপলব্ধি করলেন বেঁচে থাকার প্রেরণার সঙ্গে চৈতন্যের বিরোধ আছে। এ-বিরোধ প্রাচীন, এবং অলৌকিক মধ্যস্থতা বিনা এ-বিরোধের সমন্বয় প্রায় অসম্ভব। অর্জুনের অবশ হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়েছিল; দেবতা তাঁকে সাহায্য না-করলে আবার সে-ধনুক হাতে তুলে নেবার সাধ্য এমনকি তাঁরও ছিলো না। আর সেই প্রেমিক কিশোর, বিবেকহীন, সুন্দর গ্রীক দেবীগণ যাঁর ইন্দ্রিয়গুলিতে ভর করলেও যাঁর হৃদয় মৃত্যুকে ভুলতে পারেনি, সেই কীটস বেঁচে থাকার জন্য কত কৌশলই না অবলম্বন করেছিলেন! আলস্য, বিস্মৃতি, সৌন্দর্য —নিশ্চেতনায় অন্তত নিশ্চিন্ত করুক, ভুলিয়ে দিক তাঁর ভ্রাতার মৃত্যু, তাঁর নিজের অচিকিৎস্য ব্যাধি, তাঁর অতৃপ্ত প্রেমের তীব্রতা। কীটস মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রেমকে পরিপূর্ণ, জীবনকে অনন্ত ও মৃত্যুকে উষ্ণরূপে দেখতে পেরেছিলেন। কিন্তু সে-মুহূর্ত ক্ষীণ। মহাকাব্যের প্রচেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হলো, রয়ে গেল শুধু শান্তির আকুতি, সমাধানের আভাস। জীবনানন্দ যখন সমন্বয়সাধনে উদ্যোগী হলেন তখন তাঁর হাতে ছিলো দীর্ঘ পনের বছর, আর পাথেয় ছিলো পয়ার ছন্দ এবং প্রায় জন্তুদের মতো জাগ্রত ইন্দ্রিয়। জীবনানন্দ অস্থির থেকে অস্থিরতর হয়ে উঠলেন। শেষ যৌবনে দেখেছিলেন অভিভূত চাষা ডিনামাইটের স্তূপের উপর বসে পৃথিবীর অনাদি তামাসা দেখছে; দেখেছিলেন গাঢ় থেকে গাঢ়তর অন্ধকারে পৃথিবী প্রবেশ করছে। কিন্তু তখনো অত্যন্ত বেশি বিচলিত হননি; 'আবহমান' কবিতাটির অন্তত প্রথম অংশে মিলগুলি পংক্তির শেষে বসানো, আর ত্রিলোকধ্বংসের ছবিও ("বাক্সের আতাফল মারীগুটিকার মতো পেকে...") কেমন ঘরোয়া। কিন্তু ক্রমে তিনি অধৈর্য হয়ে উঠলেন, অনুপম ত্রিবেদীর মৃত্যুর পর আত্মসংবরণ পীড়াদায়ক মনে হলো। এর পরের কবিতা কবিতার খোসায় মোড়া ইতিহাস, দূরদর্শন চৈতন্যহরণী শিকড়, নির্বিবেককরণী বটিকা, আশাসঞ্জীবনী সুরা, সান্ত্বনা, সেবা। একযোগে সব-কিছু হয়ে উঠল, কবিতা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু উদ্দেশ্যে হয়তো কবিতার চাইতেও মহৎ। ধীর এবং আত্মবিশ্বাসী কোনো সদাপ্রসন্ন চিকিৎসক তাঁর প্রাণপ্রিয় কাউকে অচিকিৎস্য এবং অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক কোনো ব্যাধির দ্বারা কবলিত জেনে হঠাৎ শোকে অধীর এবং যুক্তিহীন আশায় উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারেন, যেমন হঠাৎ তিনি তাঁর এতকালের আশ্রয়, তাঁর প্রিয় চিকিৎসা শাস্ত্রে সংশয়ী হয়ে বিশ্বাস করতে পারেন স্বপ্নাদ্য ভেষজ বা গুরুপ্রদত্ত মাদুলিই ভালো, বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে সহজ মন্ত্রোচ্চারণে যেমন তিনি আত্মসমর্পণ করতে পারেন, তেমনি জীবনানন্দও একসময় শোকে ব্যাকুল হয়ে কবিতাকে পরিহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন!

'পুতুলনাচের ইতিকথা'তেও মানুষেরা শুধু অভ্যাসে সচল। যে-মানুষ

জীবনকে মায়া বলে মনে করেন এমনকি তিনিও মৃত্যুকে ভয় পান; শুধু তিনি নন, আমরা সবাই অন্ধকার পথে লাঠি ঠুকে-ঠুকে চলি। এবং এমনকি আত্মহত্যাও মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। অসহায় মানুষের সেই একটিমাত্র স্বেচ্ছাচার, স্বভাবকে পরাজিত করবার তার সেই একমাত্র উপায়কে নিষ্ঠুর লেখক কেড়ে নিলেন। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় এক অন্ধ শক্তি যাদবের নিজের ও তাঁর ভক্তদের মন অধিকার করল। সে-শক্তির বাহন গুজব, খাদ্য মানুষের মন, ক্ষুধা অপরিমেয়। সারা গ্রাম, এমনকি সরকারি কর্মচারী ও শশী ডাক্তার, এক দুর্বার প্লাবনে ভেসে গেলেন। এই যুগ্ম-আত্মহত্যা, এই হৃদয়হীন, নাস্তিক মৃত্যু ও পরম সতীদাহ রোধ করে সাধ্য কার? সারা পৃথিবীর সাহিত্যে যাদবের আত্মহত্যার মতো নিষ্ঠুর, রোমাঞ্চকর ও বিশ্বাসনাশক ঘটনা বিরল। 'The Possessed' উপন্যাসে ডস্টয়েভস্কি শাটভকে হত্যা করেছিলেন, তার প্রেমকে করেননি; কিরিলভকে হত্যা করেছিলেন, তার দেবদুর্লভ ইচ্ছাশক্তিকে নয়। শাটভ ও কিরিলভ ঋষি, দেবদূত বা দেবতার চেয়েও গৌরবময়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে তার চৈতন্যের অধিকারটুকুও দিলেন না। এবং শুধু মৃত্যু নয়, জন্ম ও জীবনকেও তিনি সেই অন্ধ পশুশক্তির প্রকারান্তর বলে চিত্রিত করলেন। যামিনী কবিরাজের বউ যে শিশুকে গর্ভে ধারণ করল তাও তো তার কুড়িয়ে-পাওয়া—যেমন সে কুড়িয়ে পেয়েছিল শ্রীনাথের মেয়ের হারানো পুতুল। বেঁচেই বা ছিলো কেন? সৌন্দর্য তার হরণ করে নিয়ে গেল রোগে, তবু দেখা গেল গোপাল তার কাছে ফিরে এসেছে জৈব প্রয়োজনে, এমনকি প্রেম এ-জগতে বিকশিত ও বিনষ্ট হয় কোনো সচেতন শক্তির ইচ্ছায় নয়; উদ্ভিদের মতো মানুষের ঋতুসমাগমে অঙ্কুরোদগম হয়, প্রেম নামক সেই ঋতু প্রাণ মুকুল বসন্তে যেমন বিকশিত হয় কাল অতীত হলে ঝরেও যায়। শুধু কি প্রেম? মানুষের চেতনা যেন এক ছাঁকুনি মাত্র, কোনো-এক আদিম কটাহ থেকে উত্থিত কালো ধোঁয়া তাতে শোধিক হয়ে বাইরে নির্গত হয়। এক নিশ্চেতন শক্তির আলোড়নে যে-সব তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা আমাদের মনের তটে আছড়ে পড়ে, আমাদের হৃদয়েও কম্পন ওঠে। সে-কম্পনকেই কখনো সাধ করে বলি প্রেম, কখনো সভয়ে চিনি বৈনাশিক বলে। হিংসা অথবা লুপ্তির আকাঙ্ক্ষা, প্রেম কিংবা বেঁচে থাকার সাধ—সবই আমাদের নাগালের বাইরে। আর, এই নিশ্চেতন নিষ্ঠুরতা দেখে আমরা যতটা বিচলিত হই, তার চেয়ে অবাক হয়ে গেছেন তিনি, আত্মগোপন করেছেন এমন এক সুদূর লোকে যে মনে হয় তাঁর কল্পনার শিশুদের চিৎকার সেখানে তাঁকে স্পর্শ করছে না; তাঁর উপন্যাস যেন স্বতঃই গড়িয়ে চলে তাঁর সাহায্য বিনা। কেমন বাস্তব, নিস্পৃহ, নৈর্ব্যক্তিক তাঁর লেখার ভঙ্গি। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র ঢংটি যেন লেখকের আত্মরক্ষার বর্ম, তিনি যে-জগৎ সৃষ্টি করেছেন তার দিকে বেশিক্ষণ তাকালে, তার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হলে তিনি উন্মাদ হয়ে যাবেন। আর বেঁচে থাকতে হলে ভুলে থাকার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে, শশী ডাক্তারের মতো ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাবে প্রেম, পৃথিবীকে বদলাবার ইচ্ছা, কল্পনা, মনুষ্যত্ব। উপন্যাসের গোড়ায় বজ্রাহত মানুষটির মৃত্যুতে শশী যতটা

বিচলিত হয়, যাদবের ইচ্ছামৃত্যুতেও ততটা হয় না। ক্রমে-ক্রমে কুসুমের প্রেম যেমন শুকিয়ে যায়, লেখকও উপন্যাস থেকে সজল, সরস ও প্রাণবন্ত সব-কিছু শুষে নেন। তা না-হলে কি আমরা শশী ডাক্তারের পরাজয় স্বীকার করে নিতে পারতাম? না পারতেন লেখক স্বয়ং? অথচ পাঠকও মানুষ মাত্র; যখন জীবন শুধুমাত্র বেঁচে থাকার অভ্যাস বলে মনে হতে থাকে তখন ইচ্ছা করে লেখক অন্তত একবারের জন্য নির্বিকার দ্রষ্টার পদ ত্যাগ করে ব্যথিত মানুষ হয়ে উঠুন। এবং ঈশ্বরের মতো, নিষ্ঠুর লেখকও কি এক সময় তাঁর নিজের জগৎ অবলোকন করে স্তম্ভিত হয়ে যাননি? তাঁর কুসুম, পশুদের মতো সরল, চৈতন্যের ক্লেদ ও ভার থেকে মুক্ত, স্বভাব-সর্বস্ব নিষ্পাপ কুসুম যখন নিজেকে শশীর কাছে দান করল তখন কে যেন বলে ওঠে: কুসুম, কুসুম, তোমার কি শুধু শরীর আছে, মন নেই? কুসুমকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্ঠুর, নিশ্চেতন জগৎকে, এ-প্রশ্ন কে করে? শশী? উপন্যাসে স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত নেই, তবু বোঝা যায় বক্তা শশী নয়। আমাদের রুদ্ধ মনের আক্ষেপে এই একবারের জন্য যোগ দেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জীবনানন্দ দুজনেই যৌবনে এমন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন যা সত্য হতে পারে, কিন্তু সহনীয় নয়। মানুষকে প্রকৃতি এমন দুর্বল করে গড়েছেন, এমন ক্ষীণ তার ইন্দ্রিয়, এমন কাতর তার শরীর যে এমনকি জড়-প্রকৃতির কতটুকু সে অনুভব করতে পারে? আমাদের শরীর যতটা গ্রহণ করে, বর্জন করে তার চেয়ে বেশি, আমাদের হৃদয় ভুলে থাকে যতটা, অনুভব করে তার ক্ষীণাংশ; আমরা তৃপ্তিতে বেঁচে থাকি আমাদের অন্ধতার সুযোগে। আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু আসন্ন, অর্বুদ শতক আগে নির্বাপিত নক্ষত্রের প্রেত প্রতি রাত্রে আকাশে হানা দিচ্ছে, কাল প্রাণীগণকে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহে ক্রমাগত রন্ধন করছে, তবু আমরা ফুর্তিতে মেতে আছি বিস্মরণ নামক সব-জ্বালা-জুড়োনো প্রলেপের সাহয্যে। জীবনানন্দ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ করলেন; এমনকি কমলালেবুর মধ্যে বধ্য পশুর প্রাণ ভরে দিলেন; হরিণীকে দিলেন আর্ত প্রণয়িনীর হৃদয়। এর পর আমরা কী কৌশলে তাদের আর্তনাদ না-শোনার ভান করতে পারি? আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেড়ে নিলেন প্রত্যেকের প্রাণ। জীবনানন্দের কল্পনায় সমস্ত প্রাণী ব্যথায় বিহ্বল, মোহ্যমান; যেমন গুবরেপোকার ডানা দেখা যায় না— এত দ্রুত তার পাখার কম্পন—জীবনানন্দের প্রাণীরা তেমনি এমন তীব্র যন্ত্রণায় কাতর যে তাদের জড় বলে ভুল হয়। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলগুলিকে জীবন্ত বলে মনে হলেও তাদের নাচায় কোনো-এক নিশ্চেতন শক্তি। বিপরীত এই দুই অভিজ্ঞান? আসলে বিপরীত নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাকৃতিক মানুষেরা জীবনানন্দের কবিতায় অন্য ছদ্মবেশে প্রবেশ করে। যে-মাছি "রক্ত ক্লেদ বসা থেকে উড়ে যায়", তিনজন ভিখিরি, সেই প্যাঁচা, এরা সবাই তো প্রকৃতির বিবেকহীন সন্তান। এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের তুল্য এক জগৎ দর্শন করেই তো জীবনানন্দের নায়কেরা ব্যথায় অবশ হয়ে জড় রূপ প্রাপ্ত হন। দুজনের মধ্যে তফাত শুধু এইটুকু

যে শশীর মুক্তির আকৃতিকে হৃদয়হীন সমাজ বিনষ্ট করল; জীবনানন্দের কবিতায় হলে সে হয়তো হৃদয় হারাত না, তার বদলে লাসকাটা ঘরে সঁপে দিত তার প্রাণ।

এমন নিষ্ঠুর জগৎ যাঁরা সৃষ্টি করলেন তাঁদের চেয়ে সহৃদয় আর কোনো লেখক আমাদের ভাষায় লেখেননি। শরৎচন্দ্রের সমবেদনা প্রধানত বালক ও স্ত্রীজাতির জন্য; তাঁর ব্যথার কারণ সামাজিক বা পারিবারিক দুর্যোগ, সে-দুর্যোগ দূর হলেই তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা সুখী গৃহস্থে পরিণত হয়। আর রবীন্দ্রনাথ বড়ো বেশি ঈশ্বরের পক্ষে; তিনি চরম আঘাতকেও পরম করুণা বলে মেনে নেন। তাঁর কল্পনায় ঈশ্বর মানুষের এমন ঘনিষ্ঠ যে যদি তার স্ত্রীপুত্রধন সবই যায়, তবু তার ঈশ্বর থাকেন। জীবনানন্দের বিষণ্ণ উট, নৈরাশ্যের নিরীশ্বরের যে বার্তাবহ, সে কখনো রবীন্দ্রনাথের জগতে হানা দেয় না।

সত্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় সে প্রবেশের চেষ্টা করে, কিন্তু সেখানে তার জান্তবতা লুপ্ত হয়, বুদ্ধির অ্যাসিডে ক্ষয়ে যায় তার বিকট গ্রীবা, অশোভন কুঁজ— সে পরিণত হয় এক বিদগ্ধ প্রাণীতে। জীবনানন্দ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা সুধীন্দ্রনাথের তুলনায় সরল নিষ্পাপ শিশুমাত্র। সুধীন্দ্রনাথ আবেগের চেয়ে শৃঙ্খলাকে, আত্মবিস্মৃতির চেয়ে নিজের উপর প্রভুত্বকে বেশি কাম্য বলে মনে করেন। তাঁর কবিতার যে-লক্ষণ আমাদের সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তা তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য, মিলগুলির বিস্ময়কর অনিবার্যতা, মিলের সংখ্যা, অপ্রত্যাশিত শব্দের যথোচিত ব্যবহার। আর জীবনানন্দ করে-পরে ঝরে-নড়ে ধরণের মিলেই সন্তুষ্ট থাকেন; তাঁর শব্দসংখ্যা কী পরিমিত এবং অধিকাংশই দেশজ;—এবং সেই এক পয়ার ছাড়া আর কোন ছন্দ তিনি স্বস্তিতে ব্যবহার করেছিলেন? তাঁর কবিতা আমাদের মুগ্ধ যত না করে, দীর্ণ করে তার ঢের বেশি; তারিফ যত না করি, তার চেয়ে বেশি যন্ত্রণা পাই।

স্বভাবকবি বলতে যে-অর্বাচীন, উন্মাদ, বন্য প্রতিভার ছবি ভেসে ওঠে তা যতই অলীক হোক, এঁদের দুজনের সঙ্গে তার কিছু মিল আছে। পুরোপুরি মিল নয়,— কে কবে মাতৃগর্ভ থেকে মহান শিল্প সৃষ্টি করতে শুরু করেছে? শিক্ষা বিনা এমনকি সহজ অথবা স্বাধীন হওয়াও যায় না; স্বতঃস্ফূর্তির অভিনয়ও আসলে কৌশল; কৃষক-কবি সবচেয়ে বেশি প্রাচীনপন্থী—অর্থাৎ অ-স্বাভাবিক;—লোকসাহিত্য কী অপরিবর্তনীয়—এবং সব দেশের লোকসাহিত্যই কেমন একই রকম,—সুতরাং গ্রামীণ-শিল্পীর গতানুগতিকতা ছাড়া গতি নেই। অন্য কবিদের মতো জীবনানন্দও শুধু ক্রমে-ক্রমে সহজ হতে শিখেছিলেন; "রৌদ্র ঝিলমিল মধ্য এশিয়ার নীল"-এর কৃত্রিমতা বর্জন করতে তাঁকেও শিখতে হয়েছিল। "জননী" ও শিক্ষানবিশের লেখা উপন্যাস এবং যদিও জীবনানন্দের কবিতা পড়ে মনে হয় তিনি গুরুমন্ত্র বিনাই তাঁর কাব্যমার্গ বেছে নিয়েছিলেন, মনে হতে পারে কাউকে অনুকরণ না করেও তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন, আসলে এমনকি তিনিও অন্যকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ অনুকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে; তরুণ জীবনানন্দের

উপর প্রভাব পড়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের। সত্যেন্দ্রনাথের তরলতা ও অতিলালিত্য, বা নজরুলের স্বাস্থ্য ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জীবনানন্দের কী মিল থাকতে পারে ? কিন্তু অসম্ভব উৎস থেকে অভাবনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করার ক্ষমতার নামই বোধ হয় প্রতিভা। এঁদের দুজনের মধ্যে যা স্থূলভাবে উপস্থিত তা জীবনানন্দ পরিশোধন করলেন— রূপান্তরিত করলেন মধ্যপ্রাচীকে তার আপেল, আঙুর, নাসপাতি, তার নরম গালিচা আর সজল তরমুজ নিয়ে। সুধীন্দ্রনাথ বেছে নিলেন বুদ্ধিকে, সভ্যতাকে, রবীন্দ্রনাথকে, আর জীবনানন্দ বরণ করলেন দূরদ্রষ্টা সাধকের পথ। দুজনে যে দুই ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে কবিতা সম্পর্কে তাঁদের দুই বিখ্যাত উক্তিতে: "সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি", এবং "মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট; আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ"। জীবনানন্দের উক্তিটি আক্ষরিক অর্থে এতই সত্য যে শুধু তা-ই বলা যদি জীবনানন্দের উদ্দেশ্য হতো তবে না-বলাই হয়তো ভালো ছিলো; আর সুধীন্দ্রনাথের ঘোষণাটিকে আমরা আক্ষরিক অর্থে নিতে পারি না, কেননা তাঁর কাব্যকলা স্পষ্টতই মালার্মে-পন্থী নয়। আসলে, জীবনানন্দ রোমান্টিকধর্মের মূল বিশ্বাসটিকে প্রকাশ করেছিলেন—শিক্ষা নয়, প্রেরণা কবিতার জনক; কবিব্রত কেউ ইচ্ছে করে গ্রহণ করে না, এক নিষ্ঠুর ডাকিনী কারো-কারো উপর ভর করে; কবিতায়, কবির নয়, সেই আশ্রয়ী প্রেতের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি, কারণ কবিত্ব এক অযাচিত, অপ্রত্যাশিত, অপরিত্যাজ্য সৌভাগ্য; শিক্ষিত সবাই হতে পারে কিন্তু কবি শুধু তিনি, যাঁর উপর দেবী ভর করেন। আর সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের মধ্যে প্রতীকীবাদের বুদ্ধিবিরোধী, এমনকি প্রতীকবিরোধী রূপটিকে উপেক্ষা করেছেন, তিনি ইচ্ছে করে লক্ষ করেননি যে মালার্মের শব্দব্যবহার যথার্থ তো নয়ই, যথোচিত শব্দ যাতে ব্যবহার করতে না হয় তারই জন্য মালার্মের সব পরিশ্রম। সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের মধ্যে সেই ঈশিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন যা তিনিও কামনা করেন। প্রেরণানির্গত, অসংবরণীয়, অসংশোধিত কাব্যস্রোতের বাহক হতে তিনি চান না। নিপুণতা চেয়েছেন তিনি, চেয়েছেন 'স্বায়ত্তশাসন', কবিতার উপর স্রষ্টার কর্তৃত্ব চেয়েছেন।

এই দুইজন সমবয়স্ক কবি (জীবনানন্দ বিশ শতকের এক বছর আগে জন্মেছিলেন—এক বছর পর সুধীন্দ্রনাথ) দুই বিপরীত আদর্শকে মূর্ত করলেন। জীবনানন্দ ব্রেক, হ্যেল্ডারলীন, কীটস এবং ইয়েটস-এর মতো দিব্যদর্শী। সুধীন্দ্রনাথ কালিদাস ও হরেস, এবং ভালেরি-কল্পিত লা ফঁতেন-এর মতো সচেতন। যে জীবনানন্দকে মনে হয় এত দিশি, তাঁর কাব্যের মূল কোনো ভারতীয় কবির কবিতায় পাওয়া যাবে না; সত্যেন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামের কবিতাকে তিনি শুধু ব্যবহার করেছিলেন, তাঁদের অনুকরণ করেননি। তাঁর আদর্শ সেই সব বিদেশী সাধক-কবি যাঁরা পরম নিপুণ, যাঁরা এক দীর্ঘ যদিও বেসরকারি ঐতিহ্যের বাহক, কিন্তু যাঁদের রচনার কৌশলই এমন যে মনে হয় তা রচিত নয়, তা শুভক্ষণে প্রাপ্ত। আর সুধীন্দ্রনাথ, যাঁর ফরাসী-জর্মনে পারদর্শিতা বহুবিদিত, যাঁর প্রতীচী-প্রীতি শুধুমাত্র

সাহিত্যে আবদ্ধ নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও যার প্রভাব লক্ষ করা যায়, যাঁর কাব্যের নায়িকা বিদেশিনী এবং কাব্যগুরু মালার্মে, তাঁর কবিতা একেবারেই ভারতীয় এবং তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর কাব্য সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত।

তবুও, জীবনানন্দ বিদেশ থেকে যত কিছুই আহরণ করে থাকুন, যতই তিনি অনুকরণ করুন অপরকে, তাঁকে মনে হয় কোনো-কোনো বিষয়ে শিশুর মতো সরল, শিশুদের মতো অশিক্ষিত। এমন হতে পারে যে তাঁকে এত নতুন, এ-রকম স্বপ্রসৃত মনে হবার কারণ এই যে তাঁর আদর্শ অপর কোনো ভারতীয় কবি নন— মহাভারত এবং কালিদাসের চিহ্নমাত্র নেই তাঁর কাব্যে—অথচ তাঁর সারল্য অভিনয় নয়। তিনি নিজেকে ঘোষণা করতে চাননি বলেই দেবী তাঁর মধ্য দিয়ে নিজেকে অত সহজে প্রকাশ করতে পেরেছেন। এত স্বচ্ছ, এমন তিমিরভেদী তাঁর দৃষ্টি তার কারণ তিনি অহমিকাহীন। কত নিচু প্রাণী তাঁর কবিতায় প্রবেশ করেছে, কত সূক্ষ্ম বস্তু, কত ঘোর রহস্য হয়েছে উদ্‌ঘাটিত। তার কারণ তিনি শ্রদ্ধাভরে এমন কি মাছির চরণের প্রতি তাঁর দৃষ্টি অবনত করেছিলেন। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তো চেতনাতে অন্য কোনো কিছুর বর্ষণ ধারণ করার জন্য সৃষ্ট পাত্রবিশেষ। তাঁর মধ্যে অহমিকা তো নেইই, মাঝে-মাঝে মনে হয় তাঁর বিনয় প্রায় আত্মবিলোপকারী। এঁদের দুজনেরই শিল্পের মধ্যে মাঝে-মাঝে এমন এক মধুর বালক-মন প্রকাশ পায়, যা দেখে আমরা —বিদগ্ধ, সুরুচিকাতর, আত্মসচেতন পাঠকেরা —আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। যখন জীবনানন্দ, কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েড, ডারুইনের উল্লেখ করেন তখন স্পষ্টই বোঝা যায় নতুন পুতুল পেয়ে বালিকার মতো তাঁর চমৎকৃত হচ্ছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধনী শ্রেণীর পারিবারিক জীবনের যে বর্ণনা দেন তা থেকে অনুমান করা যায় যে এ-জীবন তিনি জানেন না, কিন্তু খেলার ঘরে বন্দী শিশুর মতো তিনি দেয়ালের ওপারের জগৎকে ইচ্ছেমতো ভরিয়ে তুলছেন। জীবনানন্দের "সকলের আগে নিজে অথবা নিজের নিজের নেশন" মনে করিয়ে দেয় কোনো গ্রাম্য সাধকের বাচনভঙ্গি; যামিনী রায় যেমন মানুষজাতিকে বোঝাতে "হিউমন" ছাড়া অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করেন না, জীবনানন্দও "নেশন" শব্দটিকে যেন একটু আলাদা মূল্য দিয়েছিলেন, একটু বেশি ভারি বলে মনে করেছিলেন।

এঁদের এই সরলতাকে গ্রাম্যতা বলেও ভুল করা সম্ভব। এটুকু নিশ্চিত যে গ্রাম্য না হোক, এঁদের রচনার পরিবেশ বাংলা দেশের গ্রাম। জীবনানন্দের ধানসিড়ি নদী হয়তো বরিশালে নয়, হয়তো তা আসামে,—ভূগোলে পড়েছিলেন বা মানচিত্রে দেখেছিলেন শুধু— হয়তো তাঁর খেজুর ছায়া সুমেরু-ম্যমি বাইবেল কিংবা ইতিহাসের বই থেকে আহৃত, কিন্তু স্পষ্টতই তিনি গ্রামকে (গ্রাম ঠিক নয়, গ্রামের গণ্ডির বাইরের নির্জনতাকে) এমন কি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ভালো চিনতেন। এ-যুগের "ভদ্রমহিলা" অথবা চিরকালের নারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেই শাশ্বত বাংলাদেশে—রাত্রে কৃষক-পরিত্যক্ত নির্জন মাঠে। ত্রিলোকধ্বংসকেও তিনি প্রাদেশিক রূপ দিয়েছেন; যে-কবিতার নাম 'পৃথিবীলোক' এবং বিশ্বের ইতিহাস ও পরিণতি যার বিষয়, সেখানে

প্রলয় আসে পদ্মার ছদ্মবেশে :

দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে;
গ্রামপতনের শব্দ হয়।

আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উপন্যাস দুটির ঘটনাস্থল বাংলাদেশের গ্রাম; এমন কি 'জননী' নামক উপন্যাসেরও পরিবেশ গ্রাম্য—যদিও থিয়েটার ও ঘোড়ার গাড়ির উল্লেখ আছে।

এমন নয় যে ইংরেজের গড়া এই কলকাতাকে তাঁরা বাদ দিয়েছেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তো বটেই, জীবনানন্দের কলকাতাও এমন এক শহর যেখানে বড়ো রাস্তা নেই, শুধু গলি আছে। প্রধানত ভিখিরি, ইহুদী ও কাফ্রিদের অধ্যুষিত এই অবাস্তব, রোমাঞ্চকর নগর শুধু রাত্রিকালে জেগে ওঠে। সংখ্যায় যে-সব সম্প্রদায় নগণ্য, নগরীর প্রাণের সঙ্গে যাদের সংযোগ নেই, নগরীর বিপুল শরীরের ত্বকের উপর বসে যারা অন্ধকারে মশার মতো একটু উদ্বৃত্ত রক্ত পান করে বেঁচে থাকে, তাদের দিয়ে জীবনানন্দ কলকাতা ভরিয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলকাতা বেকার, কেরানি ও সাম্যবাদীদের নগর, সেখানে যেন সারাক্ষণ সবাই রাস্তায় হাঁটছে। সমর সেনের কলকাতার বাসিন্দা নিরাশ বুদ্ধিজীবী। আর বুদ্ধদেব বসুর কলকাতায় কুকুরেরা রান্নাঘরের বাতাসে স্বর্গের স্বপ্ন দেখে; রহস্যময় সেই নগর, কিন্তু আমাদের অচেনা নয়। তাঁর কলকাতায় বসার ঘরও আছে। মসীজীবী বেতনভোগী নাগরিকেরা ট্রামের হাতলে ঝুলে দশটায় আপিসেও যায়। চেনা শহর মায়াময় হয়ে যায় সংগোপনে, নিভৃতে, কল্পনার প্রভাবে। বুদ্ধদেব বসুর জঞ্জাল-কুড়ুনিরাও পরম নিঃসঙ্গ; বসার ঘর পরিত্যক্ত হলে তবেই গৃহী স্বরূপ ধারণ করেন; ট্রামের হাতলে—শরীর যখন শত শরীরের সান্নিধ্যে ঘর্মাক্ত— তখনো মন সুদূর, নিঃসঙ্গ ও প্রবাসী। আর জীবনানন্দের নির্ধন, ভাবনাহীন সম্প্রদায় পশুদের মতো যূথচারী ; তাদের প্রতি জীবনানন্দের আসক্তির প্রধান কারণ হলো তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। বুদ্ধদেবের জঞ্জাল-কুড়ুনি নিঃসঙ্গ, ঈশ্বরকে তাই তার এত প্রয়োজন। 'কল্লোল'-যুগের সেই চরিত্রহীন বাউণ্ডুলে আজ প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেছেন; সেই উচ্ছৃঙ্খল শব্দবিলাসী যুবক প্রৌঢ় বয়সে এমন এক নির্মম সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন যে এমনকি গৈরিকও তাঁর পক্ষে অতিরিক্ত রঙিন, প্রকৃতি খুব বেশি উত্তপ্ত, ক্যাকটাসও বড়ো বেশি লীলায়িত। রোমান্টিক ও ক্লাসিকালের সনাতন বৈপরীত্য যে কত অর্থহীন তার প্রমাণ এই যে সেই অতি-রোমান্টিক আজ অতি-ক্লাসিকাল। অথবা, এই উন্মত্ত সন্ন্যাস, এই নিদারুণ নিস্পৃহতা, এই তৃষ্ণার্ত বৈরাগ্যও আসলে তাঁর রোমান্টিকতারই ছদ্মবেশ। তিনি চান "মলের ভাণ্ড" থেকে "সম্ভাব্য ঈশ্বর"-কে ছেঁকে তুলতে, মাংসের পচনক্রিয়াকেও এক আধ্যাত্মিক রসায়নে তিনি পরিণত করেছেন। তাঁর পতিতজন পাপবোধক্ষম ধার্মিক; জীবনানন্দের লোল নিগ্রো প্রাকৃত। "বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে" সে হাসতে পারে, তার কারণ তার মনে পাপ-পুণ্যের স্থান নেই, আছে শুধু সুখ-দুঃখের। তার

হৃদয় বেদনার দ্বারা দীর্ণ হতে পারে। পাপের স্পর্শে ক্লিন্ন হতে পারে না; সে বড়ো জোর শুধু সৎ, পুণ্যবান নয়। জীবনানন্দ উদার, সংবেদনশীল, এবং মানবপ্রেমিক; তাঁর চেতনায় ঈশ্বরের স্থান নেই, তিনি ভূলোকধর্মী। বুদ্ধদেব বসু কঠিন, ক্ষমাহীন, এমন কি নিষ্প্রেম; তিনি তাঁর দেবীর জন্য জগতের লোকে যাকে অন্যায় বলে মনে করে বোধ হয় তাও করতে পারেন; ঐহিক অর্থে তিনি সাধু নন। জগতের লোকের সুখবৃদ্ধি করতে তিনি চান না। বুদ্ধদেব বসু দুঃখকে, অসুখকে শুধু প্রয়োজনীয় নয়, কাম্য বলে মনে করেন। জীবনানন্দের অন্তিম কবিতাগুলিতে মানুষের দুঃখমোচনের জন্য এক তীব্র আকূতি লক্ষ করা যায়; বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক কবিতা পড়ে কোনো মানবহিতৈষী, পরোপকারী, সমাজসংস্কারক সমালোচকের মনে হতে পারে তিনি দুঃখকে কোনো এক তীব্র মাদকদ্রব্যের মতো ব্যবহার করেন, মনে হতে পারে তাঁর ভোগী ইন্দ্রিয় এখন এমন এক তীব্র অনুভূতি, চরম উত্তেজনা কামনা করে যা দুঃখ ছাড়া আর কিছু দিতে পারে না, মনে হতে পারে বুদ্ধদেব বসু এখন দুঃখবিলাসী।

জীবনানন্দের বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি তখনো মাঝে-মাঝে তিনি ঐ লোল নিগ্রোটির মতো প্রাকৃতিক হবার প্রার্থনা করেছেন। তখনো "জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক" বেসামাল হয়ে পড়েনি। তখনো তিনি ঘাসেদের নিশ্চিন্ত জীবন কাম্য বলে মনে করতেন। ঘাস-মাতার নিবিড় গর্ভে তিনি এমন এক উষ্ণ জীবন আবিষ্কার করেন যেখানে আত্মীয়তা আছে, ঘনিষ্ঠতা আছে, কিন্তু সংগ্রাম নেই, বিচ্ছেদ নেই, প্রাণ আছে, আর্তি নেই, বৃদ্ধি আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা নেই, নেই পরকাল। তখনো কেমন অনায়াসে সব-কিছু যোগ-বিয়োগ করেও অঙ্কের শেষে বলতে পারতেন কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে। আর কোনো-কোনো গভীর হাওয়ার রাত্রে, যখন তাঁর সুখশয্যা তরণীতে পরিণত হতো, স্ফীত মশারির পাল তুলে তাঁর নিদ্রালু দেহ নভোমণ্ডলে অভিযানে যেত, তখন তিনি সর্বকালকে এক মুর্হূতে প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। সে-মুহূর্তে ধ্বংস ও মৃত্যু ধারণ করত এক মহান কলেবর, যা দেখে ভয় করে, কিন্তু পুলকও জাগে।

আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো-এক সুখের মুহূর্তে 'হলুদপোড়া' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। নাম-গল্পটিতে মানুষ কোনো-এক নৃশংস শক্তির ক্রীড়নক-মাত্র। কিন্তু তৃতীয় গল্পটিতে চৈতন্য জয়ী হলো। রমেন সচেতন কিন্তু আত্মসচেতন নয়; অপরের দুঃখকে সে অনুভব করতে পারে, নিজের দুঃখে সে তাই কাতর হয় না; "কিশোর সন্ন্যাসীর মতো সে একেবারে নির্বিকার থাকে তা নয়, ভালবাসা দেখালে শিশুর মতো খুশি হয়ে ওঠে কিন্তু গ'লে পড়ে না"; অপরেরা তাই তার "সহজ ও অকৃত্রিম আবেগের ধাক্কায়" প্রথমে যেমন বেসামাল হয়ে পড়েন, পরে পরিবর্তিতও হন। জীবনানন্দের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও জীবন অন্তত এক সময় ধনুকের ছিলা টান ছিল। কিন্তু কী অল্প সময়ের জন্য! পরমাণুর মত্ত হৃদয়েও এক ক্ষীণ মুহূর্তের জন্য স্থিতি আসে, পরমুহূর্তেই ভাঙন শুরু হয়, হয় তাকে পরিবর্তিত হতে হয় অন্য কিছুতে, অন্য এক স্থিতাবস্থায়, অথবা সে বিনষ্ট হয়, পরিণত হয় অপর পরমাণুর

দাসে। এঁদের দুজনের জীবনেও সংকটের এমনি মুহূর্ত এসেছিল ; ধনুকের ছিলা গিয়েছিল ছিঁড়ে; আস্থা রাখা দুরূহ হয়ে উঠেছিল ; রচনার কৌশল পরিণত হয়েছিল শুধুমাত্র অভ্যাসে।

কিন্তু তার আগে তাঁরা রচনা করে গেলেন বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিক কবিতা ও উপন্যাস। জীবনানন্দ উপমার পরিচিত সামান্যতার ধারণাকে ধ্বংস করে দিলেন। বস্তুর মধ্যে অজ্ঞাত জীবন আবিষ্কার করলেন; ঘ্রাণ পরিণত হলো দৃশ্যে; ছবি পরিণত হলো স্পর্শে, স্পর্শ হয়ে গেলো ধ্যান। চিত্রকল্পের মধ্যে আচম্বিতে মিলিত হলো বিপরীত অভিজ্ঞতা; বিপরীত চিত্রের মধ্যে জন্ম নিল নতুন বোধ। যেন তাঁর পাঁচটি নয়, সহস্র ইন্দ্রিয়। তাঁর শরীরে সবটুকু যেন কম্পমান স্নায়ু; তাঁর প্রত্যেক স্নায়ু শুধু যে উত্তাপ-শীতলতা, দুঃখ-হর্ষ বোধ করতে পারে তা-ই নয়, তারা যেন বিবেকবান। এবং সেই সহস্র ইন্দ্রিয় আমাদের জন্য আবিষ্কার করল এমন এক চৈতন্যময় জগৎ যা নিতান্তই আমাদের কালের। আগেকার কবিতায় জগৎ ছিলো মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতিবিম্ব, এখন মানুষ জগতের বিবেকে পরিণত হলো। আধুনিক কবিতা আবেগ এবং বুদ্ধির অতীত; জীবনানন্দ অতি-চেতনার কবিতা রচনা করলেন। প্রকৃতিব মধ্যে যিনি শুধুমাত্র সৌন্দর্য নয়, দুঃখও আবিষ্কার করলেন, তিনি কী করে আর নিছক নিসর্গ-কবিতা রচনা করবেন ? জীবনানন্দের পর থেকে বাংলা ভাষায় নিছক নিসর্গ কবিতা লুপ্ত হলো। আর নিছক প্রেমের কবিতাও। যাঁর দৃষ্টিতে প্রেম মৃত্যুর মতো সবকিছুতেই নিহিত আছে, যাঁর অনুভবে জল, নদী, বিশ্বাস—যা-কিছু সিঞ্চিত করে, জন্ম দেয়, ভাসিয়ে নেয়— তা-ই নারী; যিনি স্বীকার করেন "ঘাস, রোদ, শিশিরের কণা/তারাও জাগিয়ে গেছে আমাদের শরীরের ভিতরে কামনা", তিনি কী করে "এমন দিনে তারে বলা যায়" ধরণের প্রেমের কবিতা লিখবেন ? আর নারী পরিণত হলো প্রকৃতির তীব্রতম, মদিরতম, উষ্ণতম, স্নিগ্ধতম জন্তুতে। সে 'রক্তকরবী'র নন্দিনী নয়, কোনো মহান চিন্তার ফ্যাকাশে প্রতিমূর্তি নয়, সে-নারী প্রকৃতির রূপক নয়, সে দ্বিতীয় প্রকৃতি। আব, তাঁর কবিতায় আলো আর অন্ধকার মিশে গেল পরস্পরের মধ্যে, ঘুম আর জাগরণের ব্যবধান লুপ্ত হলো। বেঁচে থাকার সঙ্গে জড়িয়ে গেল মৃত্যু। ভাবতে অবাক লাগে যে জীবনানন্দের আগে বাংলা কবিতায় আত্মহত্যা প্রবেশ করেনি। স্থির বিশ্বাসে আত্মদানের নিদর্শন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আছে, কিন্তু আত্মহত্যার উদাহরণ নেই। এবং ইওরোপীয় সাহিত্যেও অকারণ আত্মহত্যা নতুন। জীবনানন্দের আগে সেই উট কি কোনো ভারতীয়কে আহ্বান করেনি ? ডস্টয়েভস্কির আগে কোনো ইওরোপীয়কে ?

মহাভারতেও আত্মহত্যার উল্লেখ আছে: ভীষ্মের। কিন্তু সেই মহান মৃত্যু আত্মহত্যা নয়, আত্মবিজয়। বিশ্বসাহিত্যে আর কার মৃত্যু এমন পরিপূর্ণ, এমন সার্থক? আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও ইচ্ছামৃত্যুর দৃষ্টান্ত আছে— যাদব ও তাঁর স্ত্রীর। এই যুগ্ম-আত্মহত্যার চিন্তা পাঠকদের অবশ করে ফেলে; অকারণ, নিতান্ত অকারণ এঁদের আত্মহত্যা। এমনকি 'আট বছর আগের একদিন'-এর নায়কের

মৃত্যুও এক অকারণ নয়। তবু তো সে নিজে, সজ্ঞানে, তার মৃত্যু চেয়েছিল। যাদব বা তাঁর স্ত্রী এ-মৃত্যু চাননি; অথচ পরিত্রাণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ধরা দিলেন। যেন তাঁদের মনের অন্তরালে যে-সব সূক্ষ্ম তারে বা স্নায়ুতে জীবনশক্তি সঞ্চালিত হয় তা ছিঁড়ে গেছে। এক অন্ধ শক্তির কবলে এই ইচ্ছারহিত দম্পতি নিজেদের ছেড়ে দিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে, এবং গল্পে, এই প্রথম আমরা এমন এক শক্তির পরিচয় পাই যা খাদ্য বস্ত্র যৌন প্রয়োজন এর কোনোটাই নয়, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন নই, অথচ যা আমাদের সারাক্ষণ পরিচালিত করছে। অর্থাৎ, বুদ্ধির অগম্য যে-লোক তা তিনি আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করলেন।

উপন্যাসে এতকাল ব্যাখ্যা ছিলো, ছিলো বর্ণনা, ছিলো ইতিহাস, বক্তৃতা, বিতর্ক। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় আছে চরিত্রের ও ঘটনার স্পষ্টতা, এমন স্পষ্টতা যা গাঢ় হতে-হতে পরিণত হয় অর্থের আভাসে ও সংকেতে। ভূতোর মৃত্যুর দিন যাদবের সঙ্গে শশীর দেখা— লাঠি ঠুকে-ঠুকে যাদব উপন্যাসে প্রবেশ করলেন। "লাঠি ঠুকিয়া যাদব পথ চলেন। শশী জানে এত জোরে লাঠির শব্দ করা সাপের জন্য। মরিতে যাদব কি ভয় পান— জীবন-মৃত্যু যাঁর কাছে সমান হইয়া গিয়াছে? অথবা শুধু সাপের কামড়ে মরিতে তাঁহার ভয়?" এটুকু যথেষ্ট। মুহূর্তে আমরা বাকিটা দেখতে পাই। যে-অন্তরিন্দ্রিয় দিয়ে সেই প্রথম পরিচ্ছেদের শেয়ালটি দেখেছিল, সেই রকম এক জান্তব বোধ পাঠকের মধ্যেও জাগ্রত হয়ে ওঠে।— "মরা শালিকের বাচ্চাটিকে মুখে করিয়া সামনের মাঠ দিয়া ছপছপ করিয়া পার হইয়া যাওয়ার সময় একটা শিয়াল বার বার মুখ ফিরাইয়া হারুকে দেখিয়া গেল। ওরা টের পায়। কেমন করিয়া টের পায় কে জানে!" পাঠক কী করে টের পান তা তিনি স্পষ্ট বোঝেন না— লেখক তাঁর সংকেতগুলি এমন গোপনে শশীর ভাবনায় লুকিয়ে রেখেছেন। মরতে যাদব কি ভয় পান? পান, আবার পানও না। জীবন-মৃত্যু তাঁর কাছে সমান, আবার সমানও নয়। সমান না-হলে তিনি কি নিজেকে ঐভাবে হত্যা করতেন— পলায়নের উপায় থাকা সত্ত্বেও? আবার সমানও নয়; মৃত্যুর মুহূর্তেও জনমতকে ভয় করে গেলেন, সংসারীর চেয়েও তিনি মোহগ্রস্ত। সাপের কামড়ে ভয়? হয়তো। কিন্তু আফিম-নামক বিষেই তো তাঁর মৃত্যু, এবং স্বেচ্ছায় সে-বিষ তিনি পান করলেন। টমাস মান্‌ হলে ইঙ্গিতটিকে আরো জটিল করতেন, বিস্তারিত করতেন, "পাগল দিদি" নামের অর্থময়তা আরো স্পষ্ট হতো। কিন্তু হয়তো এই ভালো, এমন সংগোপনে বিকশিত অর্থের সৌরভ তীব্রতর হলে আমরা তার মূলের সন্ধান করতাম, অজ্ঞাতকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করতাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা টোমাস মান কিংবা অন্য যে-কোনো আধুনিক ঔপন্যাসিকের রচনার মতো অতিপ্রাকৃত ব্যঞ্জনায় টইটুম্বর। শুধু তিনি তাঁদের মতো আত্মসচেতন নন। ধ্যানলব্ধ ছবির মধ্যে আরো কিছু ভরে দেবার তাঁর প্রয়াস নেই। টমাস মানের উপন্যাসে দিব্যদৃষ্টি তো আছেই, আরো আছে বুদ্ধি, আছে আবহমান সাহিত্যের স্মৃতি। তাঁর উপন্যাস শুধু সাহিত্য নয়, খুব বেশি সাহিত্য। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে কোনো সচেতন প্রয়াসই যেন নেই। মনে

হয় যেন প্রকৃতির মতোই নিজের অজ্ঞাতে তিনি স্তরে-স্তরে এমন রত্ন রেখে গেছেন, এই আমাদের মতো বিচক্ষণ ভূতত্ত্ববিদ্ না-থাকলে বুঝি সে-ঐশ্বর্য অন্ধকারেই পড়ে থাকত। যে-সব চিহ্ন দেখে কোনো আধুনিক লেখকের গুপ্ত ঐশ্বর্যের আমরা সন্ধান পাই, সে-সব ইঙ্গিত কোথায়? কোথায় সেই ব্যাকরণলঙ্ঘন, সেই আজগুবি 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা', যা দেখামাত্র এমনকি 'পত্র-পত্রিকা'র সমালোচকেরা যে কোনো উপন্যাসকে অভিনব বলে চিনতে পারেন?

প্রথম পাঠে 'পুতুল নাচের ইতিকথা'কে মনেই হয় না আধুনিক। অথচ এই উপন্যাসে অন্য কোনো যুগে রচিত হতে পারত না। আঠারো শতকের ইংরেজী উপন্যাসে কোনো-না-কোনো দার্শনিক বা নৈতিক প্রতিপাদ্য ছিলো; উনিশ শতকের উপন্যাসে ধরা পড়েছে ব্যক্তি এবং সমাজের চরিত্র, স্বাভাবিকতা ছিলো সে-যুগের শিল্পীর চরম লক্ষ্য। আর বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ ঔপন্যাসিক (এবং এমন কি বুডেনব্রকস্-এর টমাস মান্) রচনা করেছেন পুরুষানুক্রমিক ইতিহাস, ক্রমাবনতির পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা, বিভিন্ন যুগের দ্বন্দ্ব। বিশ শতকের গোড়ার দিকের উপন্যাস আসলে উনিশ শতকে রচিত হওয়া উচিত ছিলো। বিশ শতকে এসে উপন্যাস যেমন ছড়িয়ে পড়ল তেমনি আবার গুটিয়ে নিল নিজেকে; তার বিষয় হলো একদিকে যেমন সারা ব্রহ্মাণ্ড, অন্যদিকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখা, অন্তরিন্দ্রিয়ে পাওয়া অনির্বচনীয়, সূক্ষ্ম এক অভিজ্ঞান। চরিত্র নয়, ব্যক্তির অন্তস্তলে যে-রহস্যটি আছে; সমাজ নয়, সমাজের আদিতে যে-সংস্কার, প্রাণ, ধর্ম লুকিয়ে আছে; প্রকৃতি নয়, চেনা জগতের মর্মে যে-শক্তি আবদ্ধ আছে তা আত্মপ্রকাশ করল আধুনিক উপন্যাসে। মানুষ ও পশু, যন্ত্র ও প্রকৃতির সংঘর্ষে মানুষ হারাল তার বিবেক, পরিণত হলো পশুতে; জন্তুরা হারল তাদের পশুত্ব, হলো বিশুদ্ধ প্রাণী; আর প্রকৃতি তাঁর ভীরুতা থেকে মুক্ত হলেন, স্থূলত্ব হারালেন, তাঁর জড়ত্ব উবে গেল। কোথায় গেল আঠারো শতকের শিথিল, আগোছাল, নির্জীব প্রকৃতি? আর রোমান্টিকদের প্রিয় সেই সরল, স্নেহশীল প্রকৃতি? বিশ শতকে তিনি তাঁর মানবিক রূপ হারালেন; প্রকৃতি এখন নির্বিবেক, নিশ্চেতন, নির্মম। আরো পরিবর্তন হলো। এখনকার উপন্যাসে চরিত্রের বা ঘটনার, সমাজের বা প্রকৃতির ভিন্ন কোনো সত্তা নেই। লেখক আর চরিত্র উদ্ঘাটনের নিমিত্ত ঘটনার বর্ণনা করেন না, বিশাল সমাজের ছোট আয়না হিসেবে ব্যবহার করেন না ব্যক্তিচরিত্রকে, নায়কের মেজাজের প্রতিধ্বনি শোনেন না প্রকৃতির মধ্যে। যেমন ছবি শুধু রেখা নয়, রং নয়, ঘন-হাল্কা ছায়া আলো নয়, তা যেমন এইসব-কিছু দিয়ে গড়া নতুন এক সত্তা, তেমনি এ-কালের উপন্যাসে চরিত্র, ঘটনা ও সমাজ পরস্পরে মিশে যায়, সব মিলে তৈরি হয় এক পরিপূর্ণ ছবি। 'পুতুল-নাচের ইতিকথা'য় গল্প নেই, অন্তত এমন গল্প নেই যা সংক্ষেপে মনোহরণ করতে পারে। আর চরিত্র? অসংখ্য চরিত্র,—জীবন্ত, স্বাভাবিক,— কিন্তু কোনো চরিত্রকেই আমাদের চোখের সামনে বেশিক্ষণ রাখা হয় না, তারা পরিপূর্ণরূপে বিকাশলাভ করার আগেই অপসৃত হয়, যেন লেখক তাঁর জগন্নাথের রথের তলায় সবাইকেই বলি দিতে

পারেন, যেন উপন্যাসের সম্মিলিত গতিকে যে-কোনো চরিত্রের চাইতে বেশি মূল্যবান মনে করেন তিনি। এবং, উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামের ভূগোল যদিও আমাদের কাছে স্পষ্ট— বাংলাদেশের সজলতায়, শ্যালমতায় যেন উপন্যসটিও স্যাঁতসেঁত করে, পড়তে-পড়তে পাঠক চোখের সামনে সবুজ ছাড়া অন্য কোনো রং দেখতে পান না—তবুও বিশেষ করে নিসর্গশোভার বর্ণনা আছে সারা উপন্যাসে কয়েক লাইনমাত্র। বিভূতিভূষণ থেকে কত ভিন্ন তিনি! এবং তারাশঙ্করও তিনি নন। প্রকৃতি যেমন তাঁর উপন্যাসের বিষয় নয়, তেমনি গত যুগ এবং এ-যুগ, যামিনী কবিরাজ ও শশীর ডাক্তারি, যাদবের পঞ্জর-নির্মিত হাসপাতাল ও চরক-সুশ্রুতের বিরোধ তাঁকে আকৃষ্ট করে না। তাঁর উপন্যাস পড়লে অন্তত মুহূর্তের জন্য মনে হয় যে গলসওআর্দি বা তারাশঙ্কর বর্ণিত বিরোধিতা মানুষে-মানুষে বিরোধ, আত্মীয়দের মধ্যে মনোমালিন্য ও জায়ে জায়ে কলহের মতো তা স্থানীয়, ক্ষণকালীন ও নগণ্য। কী বিপুল, নিষ্ঠুর, মীমাংসাহীন যুদ্ধের সঞ্জয় তিনি; সে-যুদ্ধ চিরকাল ধরে চলে এসেছে; হিম, জড়, স্থবির নক্ষত্র থেকে পরমাণুর হৃদয়ে দুরন্ত বিদ্যুৎপুঞ্জ পর্যন্ত সব-কিছু সে-যুদ্ধে লিপ্ত; জড়ত্বের সঙ্গে চৈতন্যের সে-অনাদি সংঘর্ষে কোনো পক্ষই পরাজিত হয় না— শশী যদিও হেরে যায়, লেখক তাকে কল্পনা করেই প্রমাণ করেন চৈতন্য এখনো লুপ্ত হয়নি।

জীবনানন্দ এক সময়ে সেই সব মমতাবান মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন যারা "মরণের আগে মৃতদের জন্য" একটু আরামের ব্যবস্থা করে দেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন মৃতপ্রায় রোগীও বেঁচে থাকতে চায় "উজ্জ্বল সমাজে"র আশায়। কিন্তু শরীরেব সব অভাব দূর হয়ে গেলেও মানুষের মনে সেই নিরীশ্বরের দূত হানা দিতে পারে। আর, পদ্মার তীরে প্লাবন যেমন আসে, সে-বন্যা নেমেও যায়; প্রচণ্ড ঝড়ের আয়ুও মাত্র এক রাত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রকৃতির কৃপণতা, সামাজিক অবিচার, —সবই মানুষের চেষ্টায় বদলাচ্ছে, সংশোধিত হচ্ছে। কিন্তু কোথায়, কবে, কী উপায়ে প্রশমিত হবে শোক? 'পদ্মানদীর মাঝি'র যে-একটিমাত্র বাক্যকে মনে হয় লেখকের আপন কথা তাতে মানুষের হৃদয়ের এই দুর্বলতার উল্লেখ আছে। বন্যার জল যখন কমে এলো তখন সে যেন সংগোপনে নিঃশব্দে সংশয় প্রকাশ করে। এই কিছুক্ষণ আগেও তো প্লাবন ছিলো দুর্জয়। আকাশ যখন বিরুদ্ধতা করে মানুষ তখন আত্মগোপন করবে কোথায়? প্রলয় নেমে এসেছিল পদ্মার তীরে। সে-প্রলয় কি এত শীঘ্র দমিত হয়েছে?

কমে মাঠ ঘাটের জল।

ও তো মানুষের চোখের জল নয়, কমিবে বই কি। একদিন মালার বড় ভাই অধর খবর লইতে আসে।

অকথিত সংশয়ের উত্তর দিতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের চৈতন্য সম্পর্কে এমন এক তথ্য প্রকাশ করলেন যার পর বন্যার প্রশমনের সংবাদেও আমরা সুখে অধীর হয়ে যাই না। জীবনের সুখের কারণ নিশ্চয়ই আছে, মৃত্যু যেমন সত্য, তেমনি সত্য জন্ম। তবুও মানুষের চোখের জল শুকোয় না, তার কারণ যে-মানুষ

মারা যায় সে আর ফিরে আসে না, যে-শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তারও একদিন মৃত্যু হবে। এবং দুঃখ যেমন সুখের স্মৃতি এবং আশা মুছে ফেলতে পারে না— তা না-হলে কে আর প্রিয়জনের মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকতে পারত?— তেমনি সুখই দুঃখের উর্বরতম ভূমি। জীবনানন্দ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় "সৃষ্টির নাড়িতে হাত রেখে" টের পেয়েছিলেন "অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে র'য়ে গেছে অমোঘ আমোদ;/ তবু তারা করে নাকো পরস্পরের ঋণ শোধ"।

অথচ কয়েক বছরের মধ্যেই মনে হলো ঋণ শোধ হয়ে গেছে। জীবনানন্দ শেষ জীবনে এক নতুন শব্দের ব্যবহার শিখলেন: 'তবু'। একটি কবিতার মই "তবু"। কত কবিতা শেষ হয় "তবু" দিয়ে কত কবিতার গতি বদলে যায় এই শব্দটির আকস্মিক আর্বিভাবে।

এযুগে কোথাও কোনো আলো নেই—কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার
রাত্রির মায়ের মতো . . . . . .
তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হতে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলছে আজো—তার হৃদয়ের
ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার
বলয়ের নিজগুন র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়।

(১৯৪৬--৪৭)

মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো— আরো স্থির দিকনির্ণয়েব মতো চেতনার
পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজে
কতোদূর অগ্রসর হ'য়ে গেল জেনে নিতে আসে।

('মানুষের মৃত্যু হ'লে')

চারিদিকে নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি
অসীম স্বর্গ খুলে দিয়ে লক্ষ কোটি নরককীটের দাবি
জাগিয়ে তবু সে—কীট ধ্বংস করার মতো হ'য়ে
ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রয়েছে কিছু হয়তো হৃদয়ে।

('অনন্দা')

উদ্ধৃতির আধিক্যের কারণ আছে। শেষ জীবনে জীবনানন্দ যে শুধু "তবু"র অযৌক্তিক মায়ায় ভুলেছিলেন তা-ই নয়, তাঁর শেষ কবিতাগুলি যেন মোহাবেশে লেখা—এমন স্রোতের মতো শব্দগুলি বয়ে যায় যে মনে হয় লেখক বুঝি আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর পুরনো কবিতা ইন্দ্রিয়কে সিঞ্চিত করে তবে পৌঁছত বিবেকে, বুদ্ধিতে; তাঁর জাদুতে আমরা অবশ হতাম। এখন কেউ যেন তাঁকেই মোহিত করেছে, যেন এক ঘোরের মধ্যে লিখে চলেছিলেন তিনি। "অসীম স্বর্গ", "নীল নরক",

"কান্তিময় আলো", "অন্ধদুর্দশা", "ইতিহাসের গভীরতর শক্তি"—এরকম সব শব্দের আঘাতে আমরা কাতর হই। সেই কবি, যাঁর ঘ্রাণশক্তি ছিলো জন্তুব মতো, বাদুড়ের মতো জাগ্রত কান, মাছি এবং ইন্দ্রের মতো যাঁর সহস্র নয়ন, যাঁর ত্বক ধরণীর সূক্ষ্মতম স্পন্দন সাপের মতো গ্রহণ করত, সেই উপমার সম্রাট চিত্রকল্পের জাদুকর, হঠাৎ কেমন যেন গরিব হয়ে গেলেন, জরা যেন আচ্ছন্ন করল তাঁর ইন্দ্রিয়, স্নায়ুরা এমন দুর্বল হয়ে পড়ল যে শুধু শব্দ, অগণিত শব্দ প্রসব করতে শুরু করলেন তিনি। অবশ্য এখনো কোনো-কোনো পঙ্‌ক্তির স্পষ্টতায় চমকে উঠতে হয়, পাঠকের মন ভরে যায় গন্ধে, রঙে। "সেই রক্ত দেখে আঁশটে হৃদয়ে" (কী অতিপ্রাকৃত স্পষ্টতা ঐ অপ্রত্যাশিত বিশেষণে!) আমরা "জেগে উঠে দেখি" কে যেন (এঁ কে চিনি না, ইনি আমাদের সে—জীবনানন্দ নন) "ইতিহাসের অধম স্থূলতাকে ঘুচিয়ে দিতে জ্ঞান প্রতিভা আকাশ নক্ষত্রকে ডাকে।" আমরা লক্ষ করি "সাতটি তারার তিমিরে"ই যেন তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন. "সময়সাগরের তীরে", অতিরিক্ত আলোয় সব-কিছু ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বর্তমান জগৎ বেদনাদায়ক হতে পারে, কিন্তু তা ইন্দ্রিয়গোচর; আকাশকুসুম যতই সুন্দর হোক, তার রূপ মরচক্ষুতে কেউ দেখেনি। তাঁর পরিচিত জগৎকে তিনি অস্বীকার করলেন, কারণ তা এত স্পষ্ট, এত জীবন্ত ছিলো যে তাঁর ঈন্দ্রিয়গুলিকে অনুভূতিতরঙ্গে তা প্লাবিত করত, ব্যথা দিত বিবেকে, বুদ্ধিকে করত কাতর। এর পরিবর্তে, তিনি শুধুমাত্র ইচ্ছার দ্বারা আরেক জগৎ গড়ে তুলতে চাইলেন, কিন্তু সেই ঈপ্সিত জগৎ নিরুত্তাপ, নির্জীব, অশরীরী। আমরা বুঝি কেন তাঁর হৃদয় অনুভূতির এমন তীব্র বর্ষণে গলে গেল, ভেঙে গেল— সামান্য মানুষ আর কতটুকু সহ্য করতে পারে! কিন্তু আমাদের শরীরে আর সেই রোমাঞ্চ জাগে না, অভিভূত হয় না ইন্দ্রিয়।

আর আমাদের বুদ্ধিও নিরাশ হয়। যেন, আমরা প্রশ্ন করি, কেন তাঁকে অবিশ্বাস্য, অযৌক্তিক জোড়াতালি দিয়ে প্রত্যেক কবিতা শেষ করতেই হবে? এমনকি শিল্পীকুলচূড়ামণি ঈশ্বর তাঁর মানবজীবন-নামক মহৎ নাটক শেষ করেছেন নায়কের মৃত্যুতে; আমাদের কেন তবে প্রতি নাটককে কমেডিতে পরিণত করতেই হবে? মানুষের যে-শরীর আমরা চিনি তা রোগজীবাণুতে পূর্ণ, তার অন্ত্র কখনোই মলহীন হয় না। কোনো চিকিৎসকের যদি এমন বাসনা হয় যে তিনি তাঁর রোগীকে নির্মল করবেন, যদি তিনি মানুষের শরীরের শরীরত্ব অস্বীকার করেন, তবে বিশুদ্ধ প্রেতে পরিণত হবে তাঁর রোগী। যিনি পৃথিবীর অসম্পূর্ণতাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে পারেন না, তিনি অন্ধ, তিনিই জীবনবিরোধী, তাঁরই জীবন-বোধ শিথিল। মিথ্যাভাষণ, অজ্ঞতা ইচ্ছাকৃত অন্ধত্ব— এরাই মৃত্যুর সহায়। যে-কবি সময়সাগরের পরপারে অবস্থিত এক বিশুদ্ধ জগতের ধ্যান করেন, "আগুনে-আলোয় জ্যোতির্ময়" এক লোকে "উত্তর প্রবেশ" করেছেন বলে প্রচার করেন, মানুষকে হিংস্র, লোভী, ভীত জেনেও বলেন তবু এ-সব সে নয়, তিনি তাঁর শিল্পকে, তাঁর অভিজ্ঞতাকে, তাঁর "জীবনবোধ"কে বিসর্জন দিয়েছেন। কবিতা তত দূরই অগ্রসর হতে পারে

যত দূর মানুষের অবচেতনা, চেতনা এবং অতিচেতনার অধিগম্য। তারপরে যা আছে তা প্লাঞ্চেটে জানা যায় হয়তো, রাজনৈতিক কল্পকথায় মানুষ হয়তো হিংসা, লোভ, ভয় পরিত্যাগ করতে পারে, জাদুবিদ্যায় হয়তো প্রকৃতির নিয়ম বদলে দেয়া যায়। কিন্তু কবিতায়, দর্শনে এবং বিজ্ঞানে মেনে নিতে হয় মানব বা জড়প্রকৃতিকে। কোনো আহ্লাদী ভোটদাতা যদি নিষ্কণ্টক সমাজের আব্দার করেন তবে ভোটলোভী নির্বাচনপ্রার্থী সে-চিরসতেজ আকাশ-কুসুমের বর্ণের ছটা, গন্ধের মাদকতা বর্ণনা করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু যে-ভূতত্ত্ববিদ মনে করেন পৃথিবীর বুকে আরেক তুষারযুগ আসন্ন, তিনি, সে-সম্ভাবনা ভয়াবহ বলে, কী করে অভয় দেবেন তুষার-যুগ আসছে তবু আসছে না ? কোন জ্যোতির্বিদ বলবেন সৌরলোক অবিনশ্বর ? পাঠকের তুষ্টির জন্য কোন শেক্সপীয়র বলবেন যে মানুষ স্বর্গের শিশু ? কবে কোন কোমল ডস্টয়েভস্কি আশ্বাস দিয়েছেন পৃথিবী নিষ্পাপ বলে ?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মান্তরের কাহিনী সুবিদিত। তিনি যে জগৎ শিশুর মতো উপলব্ধি করেছিলেন তা হৃদয় বিদারক, যে-নতুন পুরাণ-কথা তিনি সংশয়হীন চিত্তে মেনে নিলেন তাতে ঐ সব হৃদয়-বিদারক ঘটনার মানে খুঁজে পাওয়া গেল। দেখা গেল যে নিষ্ঠুরতা মানুষেরই এক চিত্তবৃত্তি নয়, আসলে তা নেহাতই অস্থায়ী এক নড়বড়ে সমাজের বিধিপ্রসূত। বরং বর্তমানে যতই নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি পাবে ততই উজ্জ্বল হবে ভবিষ্যতের আশা। কী সহজে হঠাৎ সব-কিছু শিশিতে ভরা, লেবেল-মারা হয়ে গেল। এখন কোনো চরিত্র রচনা করতে তাঁকে একটুও বেগ পেতে হয় না। যে-মুহূর্তে তিনি ঠিক করেন একজন জোতদার কিংবা একজন ঠিকেদারের চরিত্র গড়তে হবে, তৎক্ষণাৎ তিনি "সাবধান বিষ"-মার্কা আলমারি থেকে নামিয়ে আনেন বোতলের পর বোতল। স্বার্থ-চিহ্নিত শিশি থেকে অনেকটা, হিংসার শিশি থেকে আরেকটু, লোভ, ক্রোধ, কপটতা থেকে বাকিটা ঢেলে নিয়ে তৈরি হয় পাঁচন। সহজ, অতি তরল হয়ে গেল সব-কিছু। চরিত্রের কোনো জটিলতা, ক্রমবিকাশ. পরিবর্তন, পরিণতি— কিছুই রইল না। রূপকথায় যেমন সকল দুঃখের কারণ একটিমাত্র ঈর্ষাতুর সতিন কিংবা সিংহাসন লোভী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, বর্তমান দুঃখের হেতু এই অযৌক্তিক সমাজ। এই সমাজ পরিবর্তিত হলেই—এবং কোন সমাজ অমর ?—মানবসন্তানের জীবন অবিমিশ্র সুখের হয়ে উঠবে। রূপকথার শেষে তিলমাত্র সংশয়েরও স্থান নেই; পাঠকের এমন মনে হয় না যে বিগত রাজা যদি বিনয়ী ও ধৈর্যবতী দুয়োরানীকে ভালো না-বেসে অস্থিরচিত্ত, লাস্যময়ী, স্বার্থপর সুয়োরানীকে ভালোবাসতে পারেন, রাজপুত্রও তবে তাঁর আজকের প্রেয়সীকে পরিত্যাগ করে আর কারো কালো কেশের সন্ধানে যেতে পারেন। আমাদের এমন সন্দেহ হয় না, তার কারণ রূপকথার চরিত্ররা মানুষ নয়, মানুষের ইচ্ছার ও আতঙ্কের ছায়া মাত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্বর্গলোকের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এমনি অপরিবর্তনীয়; তাঁর জোতদারেরা চিরকালের জন্য দাগী, তাদের লুপ্তি হতে পারে কিন্তু কখনো তাদের সম্বিৎ জাগবে না, যা-ই ঘটুক তাদের মধ্যে কেউ শ্রেণীস্বার্থ

পরিত্যাগ করে সন্তু হবে না কোনোদিন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আগে অত নিষ্ঠুর ছিলেন বলেই অত বেশি সহৃদয় হতে চেয়েছিলেন। দয়া করতে গিয়ে তিনি যা রচনা করলেন তা নিরানন্দ ও নির্জীব। কিন্তু তবুও, মাঝে-মাঝে, লেখকের সকল কৌশল ব্যর্থ করে, তাঁর চরিত্ররা বুলির খোলস ফেটে আত্মপ্রকাশ করে; তাঁর সন্তানগণ তাঁর কাছে দাবি করে শুধু নাম বা আয়ু নয়, ব্যক্তিত্ব। এবং তখন, অতিরিক্ত দয়ার বশে, লেখক তাদের কাহিনীর উপর হঠাৎ যবনিকাপাত করেন। যেমন দুর্ভিক্ষপীড়িত মাতা তাঁর ক্ষুধিত সন্তানদের আর্তনাদ সহ্য করতে না-পেরে তাদের হত্যা করেন, যে প্রাণ তাঁরই দান, যাদের এ পৃথিবীতে আনবার জন্য নিজে বারংবার মৃত্যুর দরজায় হানা দিয়েছেন, সেই প্রাণ, তাঁর নিজের শরীরের চেয়ে আপন শরীর তিনি যেমন ধ্বংস করে দিতে পারেন স্নেহের তীব্রতায়, তেমনি দয়ার আতিশয্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আর্ত, তৃষিত শিশুদের কণ্ঠরোধ করতে বাধ্য হন। গল্পের নিয়ম উপেক্ষিত হয়, শিল্পীর সততা কোথায় হারায় কে জানে। যে-কাহিনীর সূত্রপাতে তিনি সতর্ক হননি, সে-কাহিনী যখন অমোঘ ভাবে এমন এক সংকল্পের দিকে ধাবিত হয় যা তাঁর ঐ রাজনৈতিক রূপকথার বিরোধী, তখন বলতে বাধ্য হন:

গল্পের উপসংহারে লেখকের ব্যক্তিগত মন্তব্য। (গল্পলেখার চিরন্তন আইন ভঙ্গ ক'রে) . নব'র মা এবং পিসী ঐ বন্যাতেই অক্কা পেয়েছে। জ্বরে অজ্ঞান অনাথ, ছেলেমানুষ নব এবং বাচ্চা মেয়েটাও যে মরে গেছে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এটা যে বানানো গল্প নয় প্রমাণ করার জন্য জ্যান্ত সাক্ষী খাড়া করতে পারবো কিনা ভাবছি।

গল্পের জন্য "জ্যান্ত সাক্ষী"র প্রয়োজন অন্য কোনো লেখকের হয় না, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়। নব'র মা অভাবে এমন কাতর হয়েছিল যে গুজব রটেছিল সে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু সে মরেনি, টাকাও জোগাড় হয়েছিল, ডাক্তারও ডাকা হয়েছিল অনাথের জন্য। সমাজ যদি সুখের একমাত্র প্রতিবন্ধক হতো তবে কোনো দুঃখ ছিলো না তাদের। কিন্তু আরো শত্রু আছে, এক যুদ্ধে জয়ী হয়ে পরমুহূর্তেই মানুষকে রণসজ্জা ধারণ করতে হয়। সাক্ষী চাই, নিজের কাছে, ও সমবিশ্বাসীদের কাছে, প্রমাণ করা চাই যে এ-কথা সত্য। তাঁর বানানো গল্প হলে সবটুকু দায়িত্ব তাঁর, কৌশলে এড়ানো চাই সে দায়িত্ব। কারণ, এ গল্পের আসল যে উপসংহার তা এখন আর তিনি লিখতে পারেন না। সে-উপসংহার ভোলার ভান যতই করুন তিনি, আমরা ভুলিনি :

কমে মাঠঘাটের জল।
ও তো মানুষের চোখের জল নয়, কমিবেই তো।

লোককল্পনার যৌবন নির্ভীক, এমনকি দুঃসাহসী। বার্ধক্যের শিল্পী নাকি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেন, বিপরীতের সমন্বয় ঘটান, স্বর্গনরকের যুগ্ম ছবি আঁকেন। গ্যেটে এবং টমাস মান্ অন্ধকার থেকে আলোয় রোমান্টিক থেকে ক্লাসিকে, নরক থেকে স্বর্গে নাকি পৌঁছেছিলেন। শেক্সপীয়রের যে ছবি ছাত্রদের সামনে উপস্থিত

করা হয় তা এক বিষাদবিলাসী নরকদর্শী যুবকের, যিনি প্রৌঢ় বয়সে সংশয়ের ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে মিলনে, সমাধানে, শান্তিতে উপনীত হয়েছিলেন। লোককল্পনার সেই শিল্পী জীবনানন্দ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যৌবনে তাঁরা ছিলেন বেহিসেবি; পাঠককে তাঁরা শেখাতে চাননি কী ছলে বেঁচে থাকা যায়, শুধু জানাতে চেয়েছিলেন কী ব্যথার ছায়ায় আমরা বেঁচে থাকি। পরিণত বয়সে জীবনধারণের মন্ত্র দিলেন তাঁরা, শোনালেন আশার বাণী, শেখালেন বিস্মৃতির কৌশল। মহৎ শিল্পী তো তিনিই যিনি তাঁর রচনা ছেড়ে জীবনকে বরণ করেন? মানুষের চেয়েও কি মহৎ তিনি নন যিনি দুঃখের গরলকে কণ্ঠে ধারণ করে পৃথিবীকে নিরাপদ ও বাসোপযোগী করে তোলেন?

সায় দিতে যতই চাই, আমরা এ-প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ" বলতে দ্বিধা করি। আমাদের মনে হয় এ-বিস্মরণ জীবন নয়, নিদ্রা। মিথ্যা যদি সুখপ্রদ হয় তবে তীব্র ব্যথায় অধিকাংশের পক্ষে এ-বটিকা সেবন না-করে উপায় নেই, কিন্তু স্রষ্টা যিনি, তিনি কী উপায়ে মিথ্যা থেকে প্রাণ সৃষ্টি করবেন? সংজ্ঞালোপের এত উপায় থাকতেও চিকিৎসক আসন্নপ্রসবাকে জাগ্রত থাকতে বলেন। শিল্পীকে নিষ্ঠুর হতেই হবে— না-হলে অপর নয়নে অশ্রু উদ্‌গত হবে কেন? শিল্পী সেই রহস্যময় হোসেন মিয়া, যার আসল ইতিহাস কেউই সঠিক জানে না, যে যৌবন কাটিয়েছে বিদেশী বন্দরে-বন্দরে, দিক হারিয়ে যে খুঁজেছে তারার নিশানা। যা শুধু কল্পনা ছিলো, অলস মনে একটি ঝিলিকের মতো যা এসেছিল এবং সেইভাবেই যা মিলিয়ে যেতে পারত তাকে স্থায়ী রূপ সে দেবে—এই ছিলো তার জীবনের ব্রত। সেই সংকল্পকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সে সঁপে দিল তার সব-কিছু। যা কিছু সে উপার্জন করেছিল —শুধু সঞ্চিত অর্থ নয়, তার সারা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাও— সে সমর্পণ করল তার স্বপ্নকে। এবং তার উপনিবেশে আশ্রয় নিল সেই সব মানুষ, প্রকৃতি এবং সমাজ যাদের পরিত্যাগ করেছে। তারা হোসেন মিয়ার কল্পলোকে কষ্টকর কিন্তু নতুন জীবন লাভ করল। এই জীবনশিল্পীর দৃষ্টি স্বচ্ছ, হৃদয় একাগ্র। তার ঐ অদ্ভুত উপন্যাসের চরিত্র সংগ্রহ করবার জন্য সে যে-কোনো নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করতে রাজি ছিলো। তার বিষয়বুদ্ধি— যার দ্বারা সে ইতিপূর্বে ব্যবসায়ে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছিল— তা সে নিয়োগ করল স্বপ্নের কাজে। এবং যখন তার রচনায় পুরনো পৃথিবীর নীতি প্রবেশ করে বিবাদ বাধাল তখন এই নিষ্ঠুর শিল্পী বর্জন করল সেই কোমল নীতি, তার উপন্যাসের পক্ষে দুর্বল চরিত্রটিকে হোসেন মিয়া উৎপাটিত করল। হোসেন মিয়া নিষ্ঠুর মানুষ, কিন্তু সফল শিল্পী। যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস শেষ হয়ে আসে, তখন কুবেরের নৌকো চলে হোসেন মিয়ার দ্বীপের দিকে, উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী সংগ্রহ পর্ব শেষ হয়, কাহিনী এতক্ষণে জমে ওঠে।

যে-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হোসেন মিয়ার স্রষ্টা তিনি কি জানতেন না তাঁর নিজের পরিণতির অর্থ? যে-জীবনানন্দ দাশ 'তিমিরহননের গান' রচনা করেছিলেন, তিনি

কি ঐ কবিতার শেষ কয় পঙ্ক্তির রমণীয় ফাঁকি লক্ষ করেননি? তিনি কি জানতেন না যে ঐ কবিতাটিতে চাওয়া অকস্মাৎ পরিণত হয় পাওয়াতে?

আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দের মতো সত্যদর্শী কী করে ভুলে ছিলেন যে এমনি এক ফাঁকি তাঁদের সমগ্র কাব্যেও লুকিয়ে আছে? আর যদি তাঁরা এ-কথা জানতেন, তবে কী বেদনাদায়ক না জানি তাঁদের জীবনের সায়াহ্নকাল! বন্ধ্যাত্বের চেয়ে মৃত্যু বরণীয় মনে করেছিলেন তাঁরা? অথবা, তাঁরা শান্তি পেয়েছিলেন তাঁদের শিল্পকে নিদ্রার চরণে অর্ঘ্য দিয়ে— গোগোল যেমন সঁপে দিয়েছিলেন তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি. ফ্লরেন্সের চিত্রকরগণ যেমন সাভনারোলার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিজেদের অমর ছবি নিক্ষেপ করেছিলেন?

অসংখ্য প্রশ্ন, উত্তরহীন প্রশ্ন। কিন্তু যদিও এগুলি আমাদের এত ব্যাকুল করে, কে জানে এ-সব প্রশ্ন আসলে তেমন জরুরি কিনা। গ্যেটের চরম সৃষ্টি ফাউস্টের দ্বিতীয় খণ্ড নয়, তাঁর পরম সৃষ্টি তাঁর জীবন। ফাউস্ট সম্পর্কে সংশয় জাগলে, তাঁর কাব্যে তৃপ্তি না-পেলে, আমরা ধ্যান করতে পারি গ্যেটের অমর সৃষ্টি সেই দ্বিতীয় গ্যেটেকে। প্রশ্ন করতে পারি তাঁকে, তন্নতন্ন করে খুঁটিয়ে দেখতে পারি তাঁর জীবন, নিশ্চিন্ত জানি যে কোথাও-না-কোথাও তিনি আমাদের সংশয়ভঞ্জনের মন্ত্র রেখে গেছেন। কিন্তু জীবনানন্দ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সৃষ্টির বাইরে কিছু লুকিয়ে রাখেননি, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় যা নেই তা লুম্বিনি পার্কের খাতাপত্রে পাওয়া যাবে না, জীবনানন্দের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কে শত প্রশ্ন করলেও জানা যাবে না 'আট বছর আগের একদিন' রচনাকালে তাঁর আত্মার মধ্যে কী ঘটেছিল। তাঁদের এই বিনয় উপেক্ষা করলে আমরা অতিরিক্ত কিছু লাভ করব না, শুধু হারাব শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে যা পেয়েছিলাম। তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা এক স্বচ্ছ এবং শীতল গভীর হ্রদ যাতে অবগাহন করলে আমাদের নির্জীব স্নায়ুতে আবার প্রাণের স্রোত সঞ্চালিত হয়। জলের প্রাণের বর্ণ কী, তার শরীরের আসল আকৃতি কী, এমন কৌতূহল যদি কারো থাকে, যদি সে আকাশের ছায়ায় সন্তুষ্ট না হয়ে দেখতে চায় জলের মুখের ছবি, তবে সে সেচনের ফলে উপরের ছবি হারাবে কিন্তু তল পাবে না। তার চেয়ে শুধু সবিস্ময়ে চেয়ে থাকা ভালো। বস্তুত, এমন নীল, এমন শীতল, এমন গভীর সরোবর এই দেশে কেন, সারা পৃথিবীতে বিরল। এবং, যদি কোনো তরুণ হোসেন মিয়া তাঁর শিল্পকে এই প্রাণদাত্রী জলে সিঞ্চিত করেন তবে তাঁর ফসল দেখেই কি জানা যাবে না এ-জলের বর্ণ কী, শক্তি কী, কী তার অবয়ব?

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মেছিলেন ঔপন্যাসিক; দীর্ঘ ও কঠিন সাধনার দ্বারা তিনি নিজেকে পরিণত করেছিলেন প্রচারকে।' 'বই থেকে বইয়ে, জীবনানন্দের উপলব্ধির গভীরতা বেড়েছে, কিন্তু প্রকরণের উন্নতি হয়নি।' দুটোই ভুল কথা, কিন্তু এগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এঁরা যদিও মহৎ ঔপন্যাসিক ও কবি, স্ব-পেশার বাহনগুলির প্রতি এঁরা খুব বেশি মনোযোগ দেননি। নিজেদের ব্যবসায়ের যন্তরগুলির ওপর এঁদের নেই উগ্র ভালোবাসা; নেই সমব্যবসায়ীদর বিষয়ে কোনো কৌতূহল। রবীন্দ্রনাথের পর, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পেশাদার, মনস্ক লেখক হলেন বুদ্ধদেব বসু। জীবনানন্দের অধ্যাত্মজীবন নীরব ও আত্মগোপনকারী; তিনি তাঁর জটিল সৃষ্টি-প্রক্রিয়া—একটা রেমশ ওলের মতো— মাটির তলায় লুকিয়ে রাখেন। তাঁর কবিত্বের রহস্যে আমরা অভিভূত হই; তিনি অনন্য, অননুকরণীয়। কিন্তু যাঁরা নিজেরা লেখক হতে চান, তাঁদের অনুধাবনীয় হচ্ছেন বুদ্ধদেব। ভাষার কারিগরি শেখবার মতো, রবীন্দ্রনাথের পর এমন কামারশালা আর দ্বিতীয় নেই। নেই লেখকপেশার পরিশ্রম ও মর্যাদার বুদ্ধদেবের চেয়ে উচ্চতর দৃষ্টান্ত। তিনি বাংলাভাষার লেখকের জন্য এমন মান স্থাপন করেছেন যাতে আমরা সচেতন হয়েছি যে, যদিও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মাত্রেই রবিবাসরীয় পত্রিকায় টুকিটাকি লেখা প্রকাশ করতে পারেন, লেখক হওয়াটা মনীষা ও সাধনা-সাপেক্ষ। জন্মের সময় মাতৃহীন হয়েছিলেন বুদ্ধদেব; যে আশ্রয়, যে-সান্নিধ্য, যে-উষ্ণতা মানবী মাতা তাঁকে দিতে পারেননি, তা তিনি পেয়েছিলেন দেবী বাংলাভাষার কাছ থেকে। প্রতিদানে, এই ভাষা-শ্রমিক বাংলাকে দিয়েছেন দেড়শোর বেশি বই—যাদের প্রকরণ ও বিষয়ের বৈচিত্র্য আছে, এবং যার কোনো-কোনোটি অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় রচিত, কিন্তু কোনোটিই তিলমাত্র অযত্নে নয়।

২

অযত্নে তো নয়ই, বরং একটু বেশি যত্নে, বেশি পটুতায়। বস্তুত, ভাষার ওপর তাঁর আধিপত্যই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দুর্বলতায় পরিণত হয়। তাঁর রচনা এত মসৃণ ও প্রাঞ্জল যে তাঁর উপন্যাসে কখনো-কখনো আমরা অন্ধকারের অভাব অনুভব করি। তাঁর চরিত্রেরা প্রত্যেকেই— কিশোর-উপন্যাস থেকে 'প্রেমপত্র' পর্যন্ত— খুবই সবাক; এবং তারা নিজেরা যেটুকু বা অব্যক্ত রাখে, তা লেখক—অধিকাংশ সময় যাঁর থেকে চরিত্রগুলি প্রভেদ করা যায় না— অসংখ্য সাহিত্য ও শিল্প-অনুষঙ্গের উল্লেখ

সহযোগে বুঝিয়ে দেন। তাঁর উপন্যাসের ভাষায় ও বিষয়ে, চার দশকে, অনেক বদল হয়েছে ঠিকই। আগের মতো অনুপ্রাসময়, স্বরবর্ণবহুল নয় তাঁর স্টাইল; তাঁর চরিত্রেরা কিশোর বুদ্ধদেবের ঢঙে বলা যায়— এখন আর শুধু 'বুকিশ' নয়, এবং তাদের বুকুনিও নয় কেবল ইংরেজী; তারা এখন ইংরেজী সাহিত্যের পরিধি ছেড়ে ইওরোপীয় সাহিত্যে, এবং কেবল-সাহিত্য ছেড়ে পাশ্চাত্য ছবি ও সংগীত ও ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও ধর্মেও প্রবেশ করেছে। কিন্তু তারা এখন অতি সচেতন বা বাগ্মী, কখনো-কখনো মনে হয় তারা কম কথা বললে কি একটু আড়ষ্ট হলে বেশি প্রকাশ পেত। অবশ্য এটাই বুদ্ধদেবের ঢঙ, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তিনি ভয়ানক আত্মকেন্দ্রিক। যদিও উপন্যাসের উপজীব্যই হচ্ছে মানুষে-মানুষে ভিন্নতা, বুদ্ধদেবের ছিলো না সামাজিক কি মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্যে কোনো কৌতূহল। কবিতায় যেমন, উপন্যাসেও বারবার তিনি এঁকেছেন, সাজিয়েছেন, কখনো-কখনো হেসেছেন, কেবল নিজেকে নিয়ে। আর—এবং সেটাও প্রধানত কবিরই ধ্যানের বস্তু—তাঁর উপন্যাসের নায়িকা হচ্ছেন স্বয়ং সরস্বতী। ইয়ান ফ্লেমিঙ যেমন তাঁর রহস্যোপন্যাসে ক্ষীণতম অজুহাতে জেমস বণ্ডকে দিয়ে মোটরগাড়ির দৌড় করান কি জুয়ো খেলান, বুদ্ধদেব তেমন সুযোগে-কুযোগে ভাষাতত্ত্বের কূটপ্রশ্ন তোলেন, উল্লেখ করেন কোনো চিত্রশালার ঐশ্বর্য, বর্ণনা করেন কোনো প্রতিকৃতির। এবং যখন এসবের কোনো প্রত্যক্ষ উল্লেখ করছেন না, তখনো বুদ্ধদেবের উপন্যাসে শিল্পই হচ্ছে প্রধান মাদক-শক্তি। তাঁর চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ নয়, আমরা তারিফ করি বুদ্ধদেবের ভাষা; আমাদের যুগপৎ শঙ্কা ও হর্ষের উদ্রেক করে ঝরনার মতো লেখকের স্টাইল, যা একের পর এক শাব্দিক ও তাত্ত্বিক পাথর অতিক্রম করে যায়। এই উপন্যাসগুলির জেমস বণ্ড বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং। এখানে তাঁর মোটর-দৌড়, তাঁর জুয়োর বাজিধরা, তাঁর জলের তলার মৃগয়া, সবই বাংলা ভাষার সঙ্গে। আপামর জনসাধারণ হয়তো এই দৃশ্যে মোটেই রোমাঞ্চিত হবেন না। কিন্তু অপর লেখকেরা ? বিশেষত শিক্ষানবিশ কবিরা ?

কিন্তু, বুদ্ধদেব শেখান কি শুধু শব্দ, কি ছন্দ, কি দীর্ঘ বাক্যের গঠন ? তিনি কি জাগান না কৌতূহল ? তিনি কি শিক্ষিত করেন না রুচি ? প্রথম থেকেই বুদ্ধদেব স্বদেশী ও বিদেশী সকল সাহিত্য বিষয়েই এক বিরামহীন আলোচনাধারা বাঙালী পাঠকের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করেছেন। তাঁর চরিত্রে এটা বিশেষ লক্ষণীয়। আমি আগে বলেছি তিনি ছিলেন অতি আত্মকেন্দ্রিক; সেটা ভুল; তাঁর জীবন ছিল একান্তভাবেই সাহিত্যকেন্দ্রিক। এবং তাঁর সাহিত্যের প্রতি এই অনুরাগ ও কৌতূহল সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইতেন। সমালোচনা, সম্পাদনা, অধ্যাপনা—কোনোটাই তাঁর-কবিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং সব-কিছুই একই কেন্দ্রীয় তাগিদের প্রকাশ। এমন বলা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে বঙ্গদর্শন-প্রকাশ যতটা তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বানুগ, ডেপুটিগিরি ততটা নয়। এমনও বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে শান্তিনিকেতন কি পদ্মা যতটা অন্তঃস্থ সাধনা-র সম্পাদনা ঠিক ততটা নয়, তা অনেক

বেশি বাহ্যিক ঘটনা। কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রতিটি কাজ একই ডালের কোনোটি পাতা, কোনোটি কুঁড়ি, কোনোটি ফল। কৈশোরে যে-জালে প্রগতি-পত্রিকার কুঁড়ি সম্পূর্ণ ফোটার আগেই ঝরে গেল, সেই ডালেই ফুটেছিল পঁচিশ বছর স্থায়ী 'কবিতা'। রিপন কলেজে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যাপনারই পরিণতি যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের প্রতিষ্ঠা। বাইরের আর আত্মার জীবন এমন অভেদ নয় আমাদের আর কারো।

৩

এই অভেদের প্রায় সুন্দরতম, মিষ্টতম, সবচেয়ে পুষ্টিকর ফল—এমনকি তাঁর অত্যাশ্চর্য সাহিত্য-সমালোচনার চাইতেও উপাদেয় ও পুষ্টিকর ফল—তাঁর অনুবাদ-কবিতা। বুদ্ধদেবের গদ্য এই প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। এটি কেবল তাঁর গদ্যের দ্বারা প্রভাবিত। এমনকি—এই প্রবন্ধের প্রথম দুটি বাক্যের ভিত্তিতে—এও বলা যায় যে বুদ্ধদেবের অনুকারী। এটা সত্য যে এই উনিশশো চুয়াত্তর সালে কোনো দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতে গেলে বুদ্ধদেবের গদ্যের প্রত্যক্ষ অনুকরণ না-করলেও, তার দ্বারা প্রভাবিত না-হয়ে উপায় নেই। কিন্তু তাঁর গদ্যের চেয়েও—আমার বিশ্বাস—আরো প্রভাবশালী হবে তাঁর অনুবাদ কবিতার ভাষা। বুদ্ধদেবের যে-দুটি কীর্তি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রথম, তার একটি তো, অবশ্যই, 'মহাভারতের কথা'। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি সমগ্র মহাভারতের অর্থ— নৈতিক ও নাটকীয় অর্থ— বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। নীলকণ্ঠ মহান; কোনো কবির চেয়েও মহৎ তাঁর কীর্তি; কিন্তু তিনি শ্লোকপরম্পরার বিশদ টীকাকার; মহাভারতের সামগ্রিক বার্তা কিছু আছে কিনা এই ধোঁয়াটে, অপ্রামাণ্য, দূরদার্শনিক মরীচিকা নিয়ে নীলকণ্ঠ মাথা ঘামায়নি। অরবিন্দ, গোখলে ও গান্ধী মহাভারতের অংশমাত্র—গীতা—বিষয়ে লিখেছেন এবং গীতাকে তাঁরা দেখেছেন ধর্মগ্রন্থ রূপে; তার পৌরাণিক কি ঐতিহাসিক কি নাটকীয় তাৎপর্য বিষয়ে এই মনীষীরা নিরুৎসুক। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনার পরিধি একই সঙ্গে অতিরিক্ত বিস্তৃত ও সঙ্কীর্ণ; বিস্তৃত, কারণ ভাগবত পুরাণও তাঁর আলোচনার অন্তর্গত; অপরপক্ষে সঙ্কীর্ণ, কারণ তাঁর ঘোষিত অভিপ্রায় এই 'ইতিহাসের', এই বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী রহস্যের আকরগ্রন্থের, মর্মোদঘাটন ততটা নয়, যতটা যেন তেন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা; উপরন্তু, তাঁর আলোচনার ভঙ্গিটাও বড়ো সম্প্রদায়িক ও ঝগড়ুটে। উপনিষদের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ এই রক্তস্বেদময়, অবিন্যস্ত, জটিল, বীভৎস গ্রন্থের বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলেননি। মহাভারত-বিষয়ে জীবনানন্দের তাত্ত্বিক আলোচনা পুরনো কোনো তোরঙ্গ থেকে উদ্‌ঘাটিত হবে, এমন নিশ্চয় কেউ আশা করেন না, কিন্তু তাঁর কবিতায়ও মহাভারতের কোনো উল্লেখ নেই। বস্তুত, সেই আদি যুগ থেকেই, উচ্চবর্ণের ভারতীয় কবি ও সমালোচকেরা এই জনসাধারণের প্রাণের বস্তুটি বিষয়ে নীরব; এবং তাঁদের এ-নীরবতা কর্ণভেদী। মহাভারতে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মূল দ্বন্দ্বগুলি পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে।

মহাভারত কথক প্রশ্ন তুলেছেন: ধর্ম কী ? হিংসা কি সমর্থনযোগ্য ? যজ্ঞে বলিদানের নৈতিকতা কী ? বর্ণাশ্রমের ভিত্তি কী ? শাক্যমুনি (যাঁর নাম প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও নেই, কিন্তু মহাভারতের অনেক বিতর্কেই যিনি প্রধান প্রতিপক্ষ, এবং যুধিষ্ঠির স্পষ্টতই যাঁর মানসপুত্র) কি সত্যিই মূর্তিমান অধর্ম? বর্ণ-কবি ও সমালোচকেরা এগুলি অবহেলা করেছেন, এড়িয়ে গেছেন, ব্যাকরণ ও ন্যায়ের খুঁটিনাটি প্রশ্নের সমাধানে অসামান্য সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি প্রদর্শন করেছেন। এই দু হাজার বছর, হিন্দু সমাজ বুদ্ধের দিকে চোখ বুজেছিল, এবং ধর্মকে নৈতিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করে পরিণত করেছিল আচারে। বুদ্ধদেব বসুই প্রথম—দু হাজার বছরে প্রথম—উচ্চবর্ণের কবি ও বুদ্ধিজীবী যিনি মহভারতের মুখোমুখি হলেন। এরকম কাকতালের যাঁরা মানে খোঁজেন, তাঁরা নিশ্চয় বুদ্ধদেবের নামকরণ রহস্যে অভিভূত হবেন। উপনিষদ-পুনরাবিষ্কারের মতো, মহাভারতের পুনরাবিষ্কার আধুনিক ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে একটি প্রধান নতুন অধ্যায়। এবং ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক বুদ্ধদেবকে, ব্রাহ্ম-জাগরণের পিতাদের মতোই, একজন বীজ-চিন্তার জনক হিসেবে স্বীকার কবতে বাধ্য। কিন্তু বুদ্ধদেবের যে দ্বিতীয় কীর্তি 'বাংলাভাষায় প্রথম' তা কোনো ধারণা, কোনো তত্ত্বের চেয়েও গভীর ও বীজ বস্তু; তা একেবারে ভাষারই মূল প্রাণশক্তির ব্যাপার। বুদ্ধদেবই প্রথম যিনি কোনো প্রধান বিদেশী কাব্যের একেবারে আক্ষরিক, ছন্দানুগ, অপরিবর্ধিত অনুবাদ করেছেন বাংলায়। কাশীরাম কি কৃত্তিবাস, কেউই অনুবাদক নন; পয়ারের মোটা, যান্ত্রিক, আট-সেরি-ছয়-সেরি ছাঁচে বাল্মীকিকে ধরা যায় না। বাংলা ভাষা তখনো প্রস্তুত ছিল না। এমনকি এই সেদিনও, এমনকি সত্যেন্দ্রনাথ কি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে, ভিক্তর যুগো কি এলিয়েটের কবিতা অতি শিথিল, অতি তরল, অতি গাঙ্গেয় রূপ নিয়েছে। বিষ্ণু দের 'ইকরি-মিকরি চামচিকরি', কিংবা সুধীন্দ্রনাথের হাইনে অনুবাদ চাতুর্য, তির্যকতা ও কৌশলের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, কিন্তু দু জনেরই ভাষা বড়ো আড়ষ্ট, বড়ো কৃত্রিম; এঁদের বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব এতই দৃঢ় যে অন্যের চিত্রে প্রবেশ করতে গেলে এঁরা হয় শোলার মুখোশ, নয় লোহার বর্ম, পরে আসতে বাধ্য হন। অথচ অনুবাদে প্রয়োজন পরম নম্যতা, গতিশীলতা, জলের মতো পাত্র ভেদে ভিন্ন আকার ধারণের ক্ষমতা; একটা ভাষার সব পেশীগুলি ঠিকমতো বেড়েছে কিনা তার শ্রেষ্ঠ পরীক্ষাই বোধ হয় অনুবাদ। বুদ্ধদেবের অনুবাদে অবশেষে বিশ্বাস হয় যে এমন আবছাতম অনুভূতিও নেই যার ছায়া ধরা যায় না বাংলায়, নেই ভাবের এমন সূক্ষ্ম পরিবর্তন যার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না আমাদের ভাষা। কোথায় গেল সেই অনড় জড়বাদী পয়ার ?—সেই পয়ার যাতে জগতের যাবতীয় বৈচিত্র্য ও রহস্য কার্য-কারণের সরলতম সম্পর্কে, 'তথায়-আইল-রাম-বান্ধিতে-জাঙ্গল' ধরণের বাক্যে, পরিণত হয় ? কে এই কলুর বলদকে মুক্তি দিল যাতে সে কখনো ফিঙে, কখনো তিমি, কখনো শিমুল তুলোর রূপ নেয় ? অবশ্যই, রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ভাগ্যবান; তিনি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী; রবীন্দ্রনাথের ভাষার শৈশব থেকে

বর্ধিত। তাঁর অনুবাদ থেকে টের পাওয়া গেল, বাংলার কতদূর বৃদ্ধি ঘটেছে। বোদলেয়ার একজন মহৎ কবি শুধু নন, একজন বিচিত্র ও বিপরীত কবি। 'ক্লেদজ কুসুমে' নেই এমন ছন্দ, পঙ্‌ক্তিবিন্যাস কি মিলের জটিল অনুক্রম, ফরাসী সাহিত্যে যা অন্যত্র আছে। ক্ল্যাসিকাল থেকে রোমান্টিক, স্বর্গীয় থেকে নারকীয়, কৃত্রিম থেকে বাস্তব, ভাবগম্ভীর থেকে সভ্য ও পরিহাসময়— বোদলেয়ার এক মেরু থেকে অপর মেরুতে সারাক্ষণ দুলছেন। তাঁকে বাংলার মতো এক সুদূর ভাষায় অনুবাদ? এটা যিনি পারেন, তিনি নিজে যদি এই যুগের একজন প্রধান কবি না-ও হতেন, কৃত্তিবাস কি রাজা জেমস-এর বাইবেল অনুবাদকদের মতো তিনি চিরস্মরণীয়। শুধু বোদলেয়ার নয়। ইনি ক্ল্যাসিকাল ও আধুনিক, ভারতীয় ও ইওরোপীয় উভয় সাহিত্যের ধারাই প্রভাহিত করেছেন আমাদের ভাষায়। বস্তুত, শুধু যদি কালিদাস ও বোদলেয়ারের ভূমিকা দুটিই সারা জীবনে লিখে থাকতেন কেউ, তাহলেও বাংলা সাহিত্যের অমরদের তিনি হতেন অন্যতম। সমালোচনাও যদি সাহিত্যের একটি বিভাগ হয়, তবে ঐ প্রবন্ধ দুটির লেখক একটি বিভাগে অন্তত অদ্বিতীয়।

৪

কিন্তু, ঐ অনুবাদগুলির দিকে আরেকবার তাকান! বুদ্ধদেবের শব্দের ঝুলি বড়ো ছিল বলেই কি 'ক্লেদজ-কুসুম'গুলিকে তিনি এমন সার্থক বাংলা কবিতায় পরিণত করতে পারলেন? সুধীন্দ্রনাথের শব্দভাণ্ডার কি বুদ্ধদেবের চেয়ে ছোট ছিল? বুদ্ধদেবের অনেক অনুবাদ—যেমন 'সুন্দর জাহাজ'—বাংলাতে আশ্চর্য স্বাভাবিক ও প্রাণময়; তাদের অনুবাদ বলে মনেই হয় না। এতগুলি কবিতাকে কী করে করলেন বুদ্ধদেব জীবনদান? কই, ইংরেজ অনুবাদক তো তা পারেননি! যদি ভাষার বিবর্তনই একমাত্র শর্ত হয়—অনুবাদকের নিজস্ব কোনো ক্ষমতার প্রয়োজন না-থাকে—তবে ইংরেজীতে কেন এই কবিতাগুলি এমন জীবন্ত নয়? নিচের কবিতাটি পড়ুন; এটা এখন বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি; রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কি 'উর্বশীর' পাশেই এর স্থান।

সুন্দর জাহাজ

অলস মায়াবিনী, বলবো তোরে, শোন,
অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ।
আঁকবো অপরূপ মাধুরী—
বালিকা-মহিলার মিলন-মোহনার চাতুরী।

যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান,
তখন মানি তোকে সুতনু তরণীর সাগর-অভিযান।
তেমনি চঞ্চল, উত্তাল,
শিথিল, মন্থর ছন্দে হেলে-দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল।

দৃপ্ত গ্রীবা তোর, নধর স্কন্ধের আয়োজন
দেখায় মাথাটির কত যে অদ্ভুত বিকিরণ;
সৌম্য বিজয়ের নির্যাস
ছড়িয়ে, ওরে শিশু-রাজ্ঞী! তোর পথে হেলায় চ'লে যাস।

অলস মায়াবিনী, বলবো তোকে, শোন,
অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ।
আঁকবো অপরূপ মাধুরী—
বালিকা-মহিলার মিলন-মোহনার চাতুরী।

এগিয়ে আসে তোর নিটোল, স্তনভার রেশমে অবিরাম,
অনেক দ্বৈরথে বিজয়ী ওরা দুটি বর্ম অভিরাম—
যুগল ঢাল ধরে কত না
সুগোল, রেখায়িত আলোক-রশ্মির দ্যোতনা।

উগ্র ঢাল, তার তীক্ষ্ণ শরমুখ রঙিন, কোপনীয়,
রেখেছে সঞ্চিত যা-কিছু মায়াময়, মধুর, গোপনীয়—
আসব, সুরা, সৌগন্ধ্য—
বুদ্ধি বানচাল, হৃদয়ে প্রলাপের ছন্দ।

যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান,
তখন মানি তোকে সুতনু তরণীর সাগর-অভিযান।
তেমনি চঞ্চল, উত্তাল,
শিথিল, মন্থর ছন্দে হেলে-দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল।

মহান জঙ্ঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন।
যেন রে ডাকিনীরা দু-জনে
গভীর খলে নাড়ে কালিমা-ঘন এক পাঁচনে।

প্রবল নায়কের বিরোধী খেলোয়াড় অকাতর,
ও-দুটি বাহু যেন ক্লান্তি ঝলকিত অজগর,
প্রেমিক বাঁধা পড়ে ক্ষমাহীন
অতি কঠিন তোর হৃদয় কারাগারে চিরদিন।
দৃপ্ত গ্রীবা তোর, নধর স্কন্ধের আয়োজন,
দেখায় মাথাটির কত না অদ্ভুত বিকিরণ,
সৌম্য বিজয়ের নির্যাস
ছড়িয়ে, ওরে শিশু-রাজ্ঞী। তোর পথে হেলায় চ'লে যাস।

এই কবিতাটি যেন বাংলা ঐতিহ্যেরই পরিপূরক—'উর্বশী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র উভয়েরই প্রতিধ্বনিময়। এটা কি কেবল 'অনুবাদ'? বুদ্ধদেব উনিশশো পঞ্চাশের আগেও অনুবাদ করেছেন। কিন্তু সেগুলি অনেক হাল্কা, বুদ্ধদেব অনেক

'স্বাধীনতা' নিয়েছেন, অনেক পরিবর্তন করেছেন মূলের, অথচ তাতে শব্দ-সংখ্যাই কেবল বেড়েছে কিন্তু অনুবাদগুলি সহজ কি অনাড়ষ্ট হয়নি। বোদলেয়ার ও কালিদাসের অনুবাদে লক্ষণীয় হচ্ছে সংহতি; এ দুজনের মতোই বাঙালী কবিটিও আঙ্গিকে একজন ক্লাসিসিস্ট। শুধু অনুবাদে নয়, উনিশশো পঞ্চাশের মাঝামাঝি শব্দের বন্যা নেবে গিয়ে, বুদ্ধদেবের সাহিত্যের সকল বিভাগেই দেখা দিল অর্থের, অভিজ্ঞতার ঘন পলি। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'-র কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু এমন কি 'উত্তর তিরিশ' ও 'কালের পুতুল'-এর তুলনাতেও কত পরিণত বুদ্ধদেবের এ-যুগের গদ্য। তিনি আর ভেসে যান না বাক্যের পর বাক্যের উচ্ছ্বাসে; তাঁর সাহিত্যিক রুচি চিরকালই খুব তীক্ষ্ণ, কিন্তু এখন তাঁর সমালোচনায় এসেছে চিন্তার সেই গভীরতা এবং সাহিত্য পাঠের সেই প্রসার যা সুধীন্দ্রনাথ এতকাল আকাঙ্ক্ষা করে এসেছিলেন। এবং এই পরিণতিরই সংকেত হচ্ছে কালিদাসের ভূমিকায় 'শুধু প্রতিশব্দের স্তূপীকরণের' বিরুদ্ধে, শব্দের 'সম্মোহনের' বিরুদ্ধে তাঁর সতর্কবাণী। এই কি সেই তরল, শব্দ-মাতাল, তিরিশের বুদ্ধদেব বসু? ইনি এতকাল ছিলেন পারদের মতো ঝকঝকে ও অস্থির; পঞ্চাশের মাঝামাঝি প্রথম তাঁর নিজস্ব, অনন্য, বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে অশ্রুত এক কণ্ঠ শোনা গেল। প্রায় পঞ্চাশ বছরে পৌঁছে, কঙ্কাবতী-র কবি তাঁর চুমকি-আর-জরি-ঝকমকে পোষাক ত্যাগ করে নগ্ন হলেন।

ভুলে যা ঝংকার, ঝর্ণা, বরদাত্রী কঙ্কাবতীরে,
যার ঠোঁট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে স্বরলিপি শিখেছিলি তুই—

(আটচল্লিশের শীতের জন্য : ১)

এত কালের ঝংকার, ঝর্ণা, বরদাত্রী কঙ্কাবতীকে ত্যাগ করে তিনি এসে পৌঁছুলেন "যে আঁধার আলোর অধিক"-এ। এটি বুদ্ধদেবের জীবনের, ও কবিত্বের কেন্দ্রীয় অব্যয় কস্তুরী। বুদ্ধদেব পঞ্চাশ বছর ধরে বিশাল এক গাছের মতো সাহিত্যের নানান বিভাগে ডাল মেলেছেন; এবং তাতে ফুটিয়েছেন অজস্র শব্দময় অর্বাচীন পল্লব, অনেক সুন্দর ফুল, শাঁসালা পুষ্টিকর ফল, লতা, অর্কিড,—কখনো খেয়ালে, কখনো জীবিকার জন্য— এবং এই নিয়েই মাতামাতি করেছে তাঁর ক্ষুদ্র কিন্তু বিশ্বস্ত পাঠক সম্রাজ। কিন্তু নিজে বুদ্ধদেব ছিলেন, মূল থেকে মগডাল পর্যন্ত, "অলক্ষ্য, দুর্গম আর পুলকে বধির" এক কবি, যিনি সমাজ ও পরিবারের উষ্ণ ক্রোড়ে বসবাস করেও হয়ে গিয়েছিলেন হিমালয়বাসী ঋষির মতো বিবিক্ত। 'মরচে পড়া পেরেকের গান'-এর একটি কবিতায় তিনি তো নিজেকেই বর্ণনা করছেন :

ভিনদেশী

প্রেমিকারা মৃত আজ, স্তন ছিলো শালুক ফুলের মতো;
শামুকেব ভেজা গন্ধে, ঠাণ্ডা ঘাস নিবিড় পুকুর—
ছোটো, কিন্তু হাঁটুজল পেরোলে তুফান।

বন্ধু সব মৃত ;— আর নামে না উদার সন্ধ্যা বারান্দায়,
হালকা ভেলা দোলে না উতল ঢেউ কথোপথনে।—
খেলা, কিন্তু পরিণামে সামুদ্রিক যান।
প্রকৃতিও মৃত ;— জন্তুর গুহাব দ্বারে উৎকোচ অচল,
লাল বাঘ পতঙ্গে প্রণত,
বৃক্কতাপে দেয় না ভিজিয়ে কোনো নির্বোধ সন্তান।
শুধু—যতক্ষণ
গাছে-গাছে ডাকিনীরা মুণ্ড নাড়ে, তাল দেয় শূলবদ্ধ বিড়ালীর আর্তনাদ—
বৃষ্টির অস্পষ্ট রাতে ফুটপাতে প'ড়ে থাকে এক
ভিনদেশী হৃৎপিণ্ড,
স্পর্শময়, ক্রমশ বিদ্বান।

এই "ভিনদেশী হৃৎপিণ্ড" তার লেখার টেবিলের নির্বাসন থেকে এক খুব কূট আত্মজীবনী বিধৃত করে গেছে বুদ্ধদেবের পরিণত কবিতা, নাটকে ও গল্পে। এগুলি তির্যক, সূক্ষ্ম রহস্যে আবৃত. নানান বিরোধাভাসে ভরা। তাঁব শেষ কয়টি কবিতার বইয়ের নামের মধ্যেই আছে এক মর্মান্তিক বিরোধাভাস, এক দুঃখজয়ী রসিকতা —'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' (অথবা, 'জন্মের আগে: মৃত্যুর পরে'); 'যে আঁধার আলোর অধিক', 'মরচে-পড়া পেরেকের গান;' 'একদিন: চিরদিন;' 'স্বাগতবিদায়'। স্পষ্টতই, এক মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঘটেছিল তাঁর পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি, এমনি এক শীত যার কনকনে বাতাসে ঝরে গিয়েছিল বুদ্ধদেবের ভাষার অবান্তর পল্লব। তিনি একেবারে ধীরে-ধীরে পুনর্নির্মাণ করে নিলেন; মেনে নিলেন বিচ্ছেদ; ফিরে এলেন আবার সৃষ্টির কাছে। কৈশোরেও তিনি জীবন থেকে পশ্চাদপসরণ করে আশ্রয় নিয়েছিলেন বইয়ের দুর্গে। কিন্তু কী ঘন, কী স্মৃতিময় এই দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তন! এই কবিতা থেকে যা-কিছু শৌখিন সব ঝরে গেছে; এরকম শক্ত-মন ও আঁটো-গড়নের কবিতা আমাদের ভাষায় আর কেউ কি লিখেছেন?

আটচল্লিশের শীতের জন্য

প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দে।
ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায়— ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ,
ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যাকটাস,
ডুবে যা নিরভিমান, একতান, বিশ্বস্ত নির্বেদে।
প্রাঙ্গণে কিছুই নেই; পারিস তো বধির হয়ে যা।
যা তোর নিজের নয়, তা শেখাতে পারে কোন মুনি?
বরং তুলে নে ঘাড়ে আদিবাসী সিনবাদের বোঝা,
ক-টি মাত্র মিল খুঁজে সারাদিন গাধার খাটুনি।

শীতের নোঙর পড়ে, আর কিসে তোর প্রয়োজন?
তীর, দ্বীপ, সিন্ধু নিয়ে জেগে ওঠে অমল দেয়াল,
এক হ'য়ে মিশে যায় ঘণ্টা, বেলা, পরিবর্তন,
রৌদ্র আব জ্যোৎস্নার তালিমারা রঙিন খেয়াল
অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে স'রে যায় নিখিল পৃথিবী,
কেননা, গতির পাবে, তারে তুই সৃষ্টি করে নিবি

(আটচল্লিশের শীতের জন্য: ২)

কিন্তু কী সেই আকার-অভিজ্ঞতা বুদ্ধদেবের এই দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনকে, কবিতার কাছে দ্বিতীয়বার আত্মসমর্পণকে, প্রথমবারের থেকে এত ভিন্ন করে তুলল? কিন্তু, তার আগে জানা দরকার প্রথমবার কী ঘটেছিল।

বুদ্ধদেব বসু কৈশোরেই এত ভালো ও এত বেশি লিখে ফেলেছিলেন, কল্লোল যুগের বালক-বিস্ময়রূপে তাঁর খ্যাতি এতই বিস্তৃত, যে আমরা লক্ষ করি না বুদ্ধদেব আসলে খুব ধীরে পরিণত এক কবি। এখনো অনেকে আছেন যাঁরা এই কবির প্রসঙ্গ উঠলে মাথা দুলিয়ে আবৃত্তি করেন :

দিনের কাজেব হাওয়াব আওয়াজ হাজার জোয়ারে রহে
হাওয়ার রথের চাকায়-চাকায় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে আকাশে রটে
কী কলবোল।
আমি সে দিনের শব্দের নিচে, আমি সে-কাজের শব্দের পিছে শুনি,
আমার বুকেব হৃদয়ের রোলে, রক্তের তোড়ে, কানে আর প্রাণে, শুনি;
(কঙ্কাবতী)
হৃদয়ের তালে তাল রেখে ঢিব ঢিব ঢিব গান গেয়ে যায়
'কঙ্কা—কঙ্কা—কঙ্কাবতী—
কঙ্কাবতী গো।...'
আঁকাবাঁকা মেঘ, এব বাঁকা চাঁদ, বাঁকারেখা চাঁদ জলের নিচে
আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা।
আমি চেয়ে থাকি, দেখি চোখ ভ'রে: মনে হয় আঁকাবাঁকা
জলে, মেঘের রেখায়
একা বাঁকা চাঁদ চুপ-চুপ করে কথা ক'য়ে যায়:
ফাঁকা আকাশের বন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঝ'রে পড়ে সুর—'কঙ্কা! কঙ্কা!
কঙ্কাবতী!'

এই শব্দের প্লাবন, এই কিশোরোচিত আকুলতা এমন অনেককে মুগ্ধ করে যাঁরা অন্য কোনো প্রকারের কবিতা আদৌ উপভোগ করেন না। আজকের পাঠক যদিও এই শব্দের পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্ত বোধ করবেন, এটা মানতেই হয় যে সার্থকনাম কল্লোল-স্টাইলের এটা একটা শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। এই নারী অবয়বহীন; এই কবিতা কোনো স্পষ্ট চিত্রকল্পহীন। কিন্তু সে-যুগের রীতিই ছিলো এই। যেমন :

মোহিনী সে-অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে
কহিয়া আমার নাম শুধাইয়ো আমার সন্ধান;
সাবধানে যেও সেথা, চোখে তব মোহ নামে পাছে,
পাছে তার মৃদুকণ্ঠে শোনো তুমি অরণ্যের গান।

[অজিত দত্ত]

মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্দাম;
মালতী, সেখানে আমি আমাব স্বাক্ষর রাখিলাম।

[অজিত দত্ত]

প্রথম সাপটা দেখবে নিথর পাথর সম্মোহিত,
কোন সে আদিম অন্ধ অঘোর অন্বেষণের দ্বিধা
আঁধার-চোঁয়ানো ছায়া-বিদ্যুৎ হেনে খোলে কুণ্ডলী।

[প্রেমেন্দ্র মিত্র]

ভুজেব ভুজঙ্গতলে হে নতাঙ্গী, নির্ভয় নির্ভরে
তোমার স্তনাগ্রচূড়া কাঁপিলো নিবিড় থরথরে।
স্ফুরৎপ্রবাল ওষ্ঠে গূঢ়ফণা চুম্বন-উৎসুক,
একপারে রক্তাশোক, অন্যতটে হিংসুক কিংশুক

[অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

যদিও এই রীতিকে তখন কেউ-কেউ অভিনব ভেবেছিলেন, পৌনঃপুনিকতা বাংলা ভাষা ও কবিতার এক মৌলিক দুর্বলতা। আমাদের ভাষা আর্য পরিবারের পূর্বতম প্রান্তবর্তী; উত্তর ইওরোপীয় কাঠিন্যের বদলে বাংলার অধিকাংশ শব্দ হাওয়াই কি তাহিতির ভাষার মতো তরল, তা ক্ষিপ্র ও সীমিত হসন্তে শেষ হয়ে যাওয়ার বদলে অলসভাবে ও ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায়। বাংলা দ্বিত্বপ্রয়োগবহুল, ধ্বন্যাত্মক ও অনুকারী। "লোকটা হাঁসফাঁস করতে-করতে যাচ্ছিলো, টপটপ করে পড়ছিলো ঘাম"—এই বাক্যটি সংজ্ঞার্থ কি সংশ্লেষ নির্ভর নয়, বাক্যটিতে বরং লোকটির ক্রিয়াকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়েছে এবং শব্দগুলি প্রতিটি কর্মের করছে অনুকরণ। "পাতায়-পাতায় ঝিরঝিরে হাওয়া"—এই বাক্যটি প্রতীকী নয়, এটিতে প্রকৃতি প্রত্যক্ষত অনুকৃত হচ্ছে। এটা একধরণের অপরিণত ও আদি উপকবিতা, যাকে অনেক বাঙালীই কবিতা বলে ভুল করেন। শিশু কি পশুদের প্রতি হামেশাই পরিণত বয়স্কেরা এই ধরণের অনুকারী ভাষা ব্যবহার করে: 'খোকা চলে হাঁটি-হাঁটি পা পা', 'হাঁউমাঁউ কাঁচা খাঁউ, মাঁনুষের গঁন্ধ পাঁউ'। কিন্তু এটা না-বিজ্ঞান, না-কবিতার ভাষা, কারণ উভয়েই দরকার—অবশ্য দুই ভিন্ন ধরণের—স্পষ্টতা ও কাঠিন্য।

আশ্চর্য এই যে অনুপ্রাস, দ্বিত্বপ্রয়োগ, অনুকারী ধ্বনির পৌনঃপুনিকতা অর্থাৎ শব্দের এই দেশজ, অতি-বাঙালী ব্যবহার সবচেয়ে বেশি করেছেন তাঁরাই, যাঁরা শব্দ-চয়নে সবচেয়ে সংস্কৃত-নির্ভর: ভারতচন্দ্র ও মধুসূদন। কল্লোল-যুগের লেখকেরা এটা বুঝতে পারলে কি কৌতুকই না বোধ করতেন যে, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র

পর, তাঁদের ভাষা খুবই প্রতিক্রিয়াশীল? যে নিজেদের যতই তাঁরা দামাল ও রোমান্টিক বলে ঘোষণা করুন, তাঁদের স্টাইল অষ্টদশ শতকী? শুধু কল্লোল গোষ্ঠীর নয়, অধিকাংশ বিদ্রোহেচ্ছু ও উত্তেজিত মানুষের কবিতায় থাকে এই অভিপ্রায় ও স্টাইলের ব্যবধান। নজরুল ইসলাম ও যুবক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বক্তব্য 'বিপ্লবী' হতে পারে, তাঁদের ভাষায় নেই আবিষ্কার, নেই রহস্য, নেই অনুভূতির ভাঙচুর। নিচের অনুপ্রাসবহুল পঙ্‌ক্তিগুলি 'অন্নদামঙ্গলের' লেখকের হাত থেকেও কোনো শিথিল মুহূর্তে বেরুতে পারত :

যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুব-চাকায়
যায় অতীত
কৃষ্ণকায়
যায় অতীত
রক্তপায়—
যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুব-চাকায়
প্রবর্তকেব ঘুর-চাকায়।—
ঐ রে দিক—
চক্রে কার
বক্রপথ
ঘুর-চাকার
বক্র পথ
ঘুর-চাকার
ছুটছে রথ
চক্র যায়!
দিগ্বিদিক
মূর্ছা যায়!
কোটি রবি শশী ঘুর পাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়।

৫

বাংলা কবিতার এই দুই ভাষা: একটা হচ্ছে রুদ্ধশ্বাস, উত্তেজিত শব্দস্রাব; অন্যটা ধীর, নিচু, দ্বিধাময়। একটি বাগ্মিতার ভাষা, অন্যটি উন্মোচনের। একটির আবেদন শ্রুতির প্রতি, অন্যটির অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার। একটিতে লেখক নিজেকে ও শব্দকে নিয়ে বিভোর, তাঁর প্রকৃতি বর্ণনায় অপর বস্তুর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না, কেবল তার ভাবাবেগে প্রকাশিত হয়। অন্যটিতে কবি জগৎ বিষযে কৌতূহলী; তিনি

প্রায় একটি স্বচ্ছ আধার, একটি নিরপেক্ষ বাহনে পরিণত হয়েছেন যার মধ্য দিয়ে অনায়াসে অপর বস্তু ও প্রাণী পাঠকের চৈতন্যে প্রবেশ করে। বুদ্ধদেব বসু প্রথম থেকে দ্বিতীয় রীতিতে পৌঁছেছেন যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। তাঁর কিশোর স্টাইল প্রথম থেকেই, ঐ ধরণের রচনা হিসেবে, খুব পরিণত। প্রায় লেখা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেব এমন এক শব্দের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন যার তরলতা ও গতি যে-কোনো লেখকের ঈর্ষনীয়। কিন্তু এই তরলতা শেষ এক ইচ্ছাতীত অভ্যেসে পরিণত হলো: 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর'-এও লেখক শক্ত মাটি ছুঁতে পারছিলেন না, শব্দের টানে ভেসে যাচ্ছিলেন। এ যাবৎ তিনি ছিলেন কল্লোল যুগেরই কবি, যদিও সেই গোষ্ঠীর অগ্রগণ্য, এবং অন্যদের চেয়ে নিরলস, রুচিবান ও শিক্ষিত। কিন্তু তিনি কেবল অন্যদের থেকে তখনো, যথা প্রেমেন্দ্র মিত্র বই-এর সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে, কবিতার প্রকরণের পরীক্ষায়, এবং সাহিত্য-বিষেয়ে সচেতনতায় ভিন্ন ছিলেন, আর একটি লক্ষণেও ছিলেন ভিন্ন: সাহিত্যের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক প্রেমে। অন্যে যে অনুরাগ জীবনকে দেয়, তা তিনি দিয়েছিলেন মুদ্রিত অক্ষরকে। এটাই 'মর্মবাণী' কি 'বন্দীর বন্দনা'র আশ্রয়হীন আবেগের কারণ।

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
বক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণীরমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি;
তাদের মেটাতে হয় বঞ্চনার দুর্দম বিক্ষোভে।

পুরানা পল্টনের এই লাজুক, তোতলা, প্রাদেশিকতা-বিষয়ে অত্যুৎসচেতন যুবকটি কেন লক্ষ বছরের শৃঙ্গার কামনাকে 'বঞ্চনার দুর্দম বিক্ষোভে' উপবাসী রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন? কারণ, বিস্তৃত সাহিত্যপাঠের ফলে, বিশেষত সুইনবর্ন-অনের্স্ট ডসন প্রমুখ শতাব্দীশেষের রোগপাণ্ডুর কবিদের প্রভাবে, কিশোরটি ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছিলেন :

আছে ক্রূর স্বার্থদৃষ্টি; আছে মূঢ় ক্লেদলিপ্ত লোভ,
হিরন্ময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে।
আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিজ্ঞাসার কুটিল কুশ্রীতা।

আছে এমনকি বোদলেয়ারেরও—অবশ্য সুইবর্নের ভাবানুবাদ-পরিস্রুত—ছায়া :

নতুন ননীর মতো তনু তব? জানি তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে কুৎসিত কঙ্কাল—

(ওগো কঙ্কাবতী)
মৃত-পীত বর্ণ তার: খড়ির মতন সাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী—
জানি, সে কিসের মূর্তি। নিঃশব্দ, বীভৎস এক রুক্ষ অট্টহাসি—
নিদারুণ দন্তহীন বিভীষিকা।

এই যুবক—যদিও বারে-বারে নিজকে ইনি কামুক ও লম্পটরূপে বর্ণনা করেন, এবং সমসাময়িক পাঠিকারা যাঁরা শয়তানির খ্যাতিতে মধুর শঙ্কায় শিউরে-শিউরে উঠতেন—আসলে অতিঅনভিজ্ঞ-এবং এঁর বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে এত আকর্ষণের বস্তুটির দিকে তিনি লজ্জায় ভালো করে তাকানইনি :

তোমার যে-স্তনরেখা বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সততস্পন্দিত—
দেখেছি অস্পষ্টতম আমি শুধু আভাস যাহার,
যাহার ঈষৎ স্পর্শ আনন্দে করেছে মোরে উন্মাদ-উন্মাদ,
জানি, তাহা স্ফীত হবে সদ্যোজাত অধরের শোষণ-তিয়াষে।

লক্ষ্য করুন, এমন কি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিদ্বন্দ্বীর নয়, "সদ্যোজাত অধরের শোষণ তিয়াষ" পর্যন্ত এই পূর্ববঙ্গীয় অনের্স্ট ডসনের অসহ্য ঠেকেছে। তাই বলে তিনি কি ভীরু ? তিনি কি জানেন না কাকে বলে পাপ ? এই কিশোর অবতরণ করেননি কি নরক বেশ্যালয়ে ? বুদ্ধদেবকে কেন আঁতুড় ঘরেই নুন খাইয়ে মারা হয়নি, এই নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন জনৈক পাঠিকা। আশ্চর্য, এঁর বেশ্যালয়ে গমনের বর্ণনার অতিরঞ্জিত, কৃত্রিম ভাষায়! মহিলাটি অনুভব করলেন না কৌতুক! বস্তুত, বড়ো নিরপরাধ এই বালক; অনেক বিশেষণ প্রয়োগ করে সে যে আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে তা কেবল এই সুকুমারমতি কবির মতো হবে নারকীয়। অন্যেরা বালকটির শয়তানিতে ভড়কাবেন তো না-ই, বরং সস্নেহ মুচকি হাসবেন!

আমি সেথা গিয়েছিনু সন্ধ্যাবেলা —প্রলুব্ধ, অস্থির
আসঙ্গ-বাসনা পঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক:
সারঙ্গ-সংগীতস্বনে শিহরিছে উৎসব-উৎসুক
হেমচ্ছটাবিচ্ছুরিত বাতায়ন প্রতি পণ্যস্ত্রীর।
মদ্য ফেনাতীব্র গন্ধ! কী-আনন্দের পশিলো রুধিরে!
উজ্জ্বল বসন বর্ণ, বিষবাষ্প উত্তপ্ত নিঃশ্বাস,
কৃত্রিম রক্তিম ওষ্ঠে লালসার বলিষ্ঠ বিলাস
আমারে ডাকিয়া নিলো তরঙ্গিত দেহগঙ্গানীরে।
সেখানে আকাশ নাই, তারা সেথা কখনো ফোটে না,
কটু গন্ধ অন্ধকারে শুধিলাম বিধাতার দেনা।

বাহিরিয়া এনু পথে। কণ্ঠ ঠেলি জঘন্য ন্যক্কার
উঠিছে ব্যাকুলে বেগে মর্মান্তিক আত্ম-অপমানে;

বিতৃষ্ণা— বিষাক্ত সর্প— রক্তস্রোতে ক্রূর ফণা হানে,
নির্ম্মম ঘৃণার কশা মর্ম্মমূলে করিছে প্রহার।
আমি যে করেছি পান ব্যগ্র কণ্ঠে এই উগ্র সুরা—
মোরে দিয়ে বিধাতাব এই শুধু ছিলো প্রয়োজন।
স্রষ্টা শুধু এই চাহে, এ-বীভৎস ইন্দ্রিয়মিলন—
নির্বিচারে প্রাণীসৃষ্টি ক'রে থাকে যেমন পশুরা।

বিধাতা ও প্রকৃতি বীভৎস; বালকটি তাহলে কোথায় পাবে আশ্রয়? কিশোর বুদ্ধদেব-এর ছিল একটাই।—বই!

বাংলা কবিতা ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ক্ষীণকায় না হোক, এক নিস্তেজ সাহিত্য। গদ্যের তখনো সৃষ্টি হয়নি। একদিকে পয়ার চোদ্দ মাত্রার শেকলে বাঁধা, অন্যদিকে মাত্রাবৃত্তের গড়ন অনির্দিষ্ট। অনুবাদ? অনুবাদ না, সংস্কৃত সাহিত্যের বিশ্বচেতনা বাংলা ভাবানুবাদের মধ্যে প্রাদেশিক খণ্ডরূপ ধারণ করেছিল। আছে বটে প্রাত্যহিক জীবনের এক উজ্জ্বল মুকুর—কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল। কিন্তু হাজার বছরের সাহিত্যসৃষ্টির এই কি যথেষ্ট ফল? আর বৈষ্ণব কবিতা? ভবিষ্যৎ গৌরবের সেই প্রথম উদ্ভাস? সত্য বটে, বৈষ্ণব কবিগণ যতগুলি ভালো কবিতা লিখেছিলেন, রবীন্দ্রপূর্ব অর্ধসহস্র বছরে অন্যান্য বাঙালী কবিরা সমবেতভাবে ততগুলি উত্তম কবিতা রচনা করেননি। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার রীতি ও বিষয়ে বৈচিত্র্যের অভাব ছিলো; এবং যেমন শুধুমাত্র সন্দেশ দিয়ে ভোজ হয় না, তেমনি শুধুমাত্র গীতিকবিতা এবং অতিরঞ্জিত জীবনচরিতের সমষ্টিকে সাবালক সাহিত্য বলা সম্ভব নয়।

এই ভাষায়, এই দরিদ্র বাংলাভাষায়, এক শতকের মধ্যে যে-বিপ্লব সাধিত হলো তার তুলনীয় ঘটনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। একটি বিপ্লব নয়, বিপ্লবের পর বিপ্লব পরিবর্তনের তরঙ্গের পর তরঙ্গ বাংলা সাহিত্যের রূপ কয়েক দশকের মধ্যে একেবারে বদলে দিল। এই বিপ্লবী শতকের আদি কবি মধুসূদনকে আমরা বোদলেয়ারের সমকালীন বলে কল্পনা করতে পারি না; তাঁর সনেটে যে-মনের প্রকাশ, তা সারে বা ওয়াটের সমধর্মী। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে যে-বিপুল পরিবর্তন এনেছিলেন তার অন্যতম ফল এই যে পরবর্তী কবিরা অনায়াসে বিশ শতকে প্রবেশ করলেন; আমাদের বিশ শতক আর ইওরোপের বিশ শতকের মধ্যে কোনো কালগত ব্যবধান রইল না। জীবনানন্দ, অথবা বুদ্ধদেব বসু, অথবা বিষ্ণু দে, সকল অর্থেই ইয়েটস, কিংবা রিলকে, কিংবা পোল এলুয়ারের সমসাময়িক। অর্থাৎ, এই একশো বছরে বাংলা কবিতা পাঁচশো বছরের পথ অতিক্রম করল, এবং এক-এক পুরুষের অভিজ্ঞতা এক-এক দশকের মধ্যে আত্মস্থ করতে হলো বাঙালী কবিকে।

যে-সকল বিপ্লবের দ্বারা আমাদের সাহিত্যের এই রূপান্তর সাধিত হলো তার একটির নায়ক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এই বিপ্লবের এমনকি নামকরণ এখনো হয়নি এবং, আজও সেই বিপ্লেবের প্রতিধ্বনি আমাদের সাহিত্যে অনুরণিত হচ্ছে বলে, তার ফলাফল ঠিক এই মুহূর্তে অনির্ণেয়। তাছাড়া, আরো কয়েকটি বিপ্লব একই সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিল। এদের একটির সঙ্গে অন্যটি এমনভাবে জড়িত হয়ে গেছে, এবং যৌথ আন্দোলন চারদিকে এমনই সাড়া তুলেছিল যে আজও আমারা শুধু বিস্মিতই

হতে পারি, বিশ্লেষণ করতে পারি না। অন্য ভাষায় যে-সকল পরিবর্তন পর-পর ঘটে, আমাদের ভাগ্যে তা সাধিত হয়েছিল একযোগে। এত দ্রুত এই সকল পরিবর্তন, এবং এমন বিচিত্র— এমনকি পরস্পরবিরোধী— এদের ফল যে আজকের পাঠক রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে কোনো সামান্য লক্ষণ আবিষ্কার করতে গিয়ে দিশেহারা হন। 'ক্লাসিসিস্ট' সুধীন্দ্রনাথ ও 'মিস্টিক' জীবনানন্দ, 'জনসমুদ্রের কবি' বিষ্ণু দে এবং 'গজদন্তমিনারবাসী' বুদ্ধদেব বসু, 'আস্তিক' অমিয় চক্রবর্তী ও 'সংশয়ী' সমর সেন— আধুনিকতা-নামক একটিমাত্র বৃক্ষে যেন একই সঙ্গে সর্ব প্রকারের ও সর্ব ঋতুর ফল ফলেছিল। সামান্য লক্ষণ? সামান্য লক্ষণ তো দূরের কথা, সেই আলোড়নের ধুলোয় বাতাস এমন আচ্ছন্ন ছিলো যে এঁদের মধ্যে স্পষ্টতম সম্পর্কগুলিও আবিষ্কার করা এতকাল সম্ভব হয়নি।

ধীরে-ধীরে বাতাস শান্ত হচ্ছে; দূরে সরে যাচ্ছে সেই আশ্চর্য যুগ; মৃত্যু, এবং মৃত্যুর চেয়েও নিষ্ঠুর বন্ধ্যাত্ব, এবং বন্ধ্যাত্বের চেয়েও শোকাবহ, রাষ্ট্রের হিম পৃষ্ঠপোষকতা আর সমাজের বিবেকনাশক স্বীকৃতি, একে-একে গ্রহণ করছে এইসব উজ্জ্বল পুরুষদের, যাঁরা বাংলা সাহিত্যেকে এমন এক চূড়ায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখান থেকে, অনেকের মতে, আর নাকি উপরে ওঠা যায় না, সম্ভব নাকি শুধু অধঃপাত। যেমন দীর্ঘ ছয় মাস বৃষ্টির পর, শরতের প্রথম রাত্রে হঠাৎ নির্মল আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা বৈশাখের পুরনো নক্ষত্রের অধিকাংশকে আর খুঁজে পাই না, আজ আমাদের সাহিত্যালোকে একের পর এক আসন শুধু শূন্য হচ্ছে। গত কয়েক বছর এক দীর্ঘ শোকযাত্রার মতো মনে হয় আমার যে-শোকযাত্রার আরম্ভ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারপর জীবনানন্দের মৃত্যুতে— যে জীবনানন্দ আমার, এবং আমার মতো আরো অনেক তরুণেব চোখে শুধুমাত্র বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি নন, যিনি আমাদের হৃদয়ের সখা, এবং করিতার গুরু, হায়, যে-গুরুকে আমি চোখে দেখিনি কোনোদিন—এবং যে শোকযাত্রার পরিণতি— সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যু।

সৌভাগ্যক্রমে, সুধীন্দ্রনাথের দেবতুল্য রূপ আমি দেখেছি। আমার পরিচিত এক দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী মহিলা— যাঁর মনে কাব্যিকতার লেশমাত্র নেই, আর যিনি অলৌকিক তো দূরের কথা, যা-কিছু অপ্রত্যক্ষ তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কূট প্রশ্ন তোলেন —বালিকা বয়সে রবীন্দ্রনাথকে দেখে 'রাজা' বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন। এবং, বহু বর্ষ পরে, প্রমথ চৌধুরীকে ঘরে ঢুকতে দেখে, ছুটে গিয়ে তিনি তাঁর পিতাকে জানান যে সেই 'রাজা'— অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ— এসেছেন। প্রমথ চৌধুরীর পরনে সেই বিশ্ববিখ্যাত জোব্বা ছিলো না, ছিলো না আলম্বিত কেশ বা শুভ্র শ্মশ্রুদাম, কোনো প্রত্যক্ষ কারণেই তাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলে ভুল করা সম্ভব ছিলো না, কিন্তু সেই বালিকা অন্তরিন্দ্রিয়— যা তখন পর্যন্ত দার্শনিক কুটিলতায় চাপা পড়েনি— ঐ দুই ভিন্নরূপ মানুষের মধ্যে আবিষ্কার করেছিল তাঁদের সাধারণ লক্ষণ—শরীরের প্রতি ভঙ্গিতে প্রতিভার আভা। বর্তমান প্রাবন্ধিকেরও সুধীন্দ্রনাথকে প্রথম বার দেখে— এত আপতিক বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও— বারে বারে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়েছিল।

আমার এমন মনে হওয়ার একটাই কারণ ভাবতে পারি; যা কিছু দৈব প্রভায় উজ্জ্বল, শক্তির অনায়াস লীলায় স্ফুরিত, অর্থাৎ যা-কিছুর মধ্যে আপোলোত্ব বা ইন্দ্রত্বের আভাস আছে— বাঙালীজাতির চিত্তে তার প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। এবং সুধীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখে চোখে লাগত আলোকের ঝলক, রোমরাজির উপর বয়ে যেত স্বাস্থ্যের বাতাস, হৃদয়ে অনুভূত হতো অক্লেশ প্রতিবার অনুকম্পন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ছিলেন দৈবানুকূল্যে অভিষিক্ত, যদিও তাঁর কাব্যে তিনি তাঁর ইন্দ্রত্বকে পরিহার করেছিলেন। এবং, যদিও কোনো-কোনো বিরল মুহূর্তে অন্য কোনো দেবতার কালো ছায়া তাঁর মুখের উপর পতিত হতে দেখেছি, অধিকাংশ সময় আপোলোর স্বর্ণচ্ছটা তাঁকে ঘিরে থাকত। জীবনানন্দের যে-একটি ছবি আমি দেখেছি, তা এক বিস্মিত এবং ধ্যানস্থ প্রেমিকের, যিনি এই জগৎরূপা নিষ্ঠুরা ও মোহিনী প্রেমিকার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন। হাসি নয়, বিহ্বলতার আভাস তাঁর অধরে। আর, সুধীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি ছবিতে ধরা পড়েছে এক ইন্দ্রকান্ত সুখী পুরুষ; অধিকাংশ ছবিতেই তাঁর মুখ হাস্যময়, যেন তাঁর উচ্চ আসন থেকে মানুষ নামক এক মর্কটশাবকের দেবানুকারী ক্রীড়াকলাপ দেখে তিনি কৌতুক অনুভব করছেন।

অবশ্য, মানুষ কিংবা পৃথিবীর সম্পর্কে তাঁর গোপন ধারণা যা-ই হোক, অপর মানুষের পক্ষে তাঁর সঙ্গ ছিলো পরম প্রীতিকর। এমন অনেক সন্ধ্যা গেছে—তার অনুরূপ কোনো সন্ধ্যা আর আসবে না—যখন তাঁর সঙ্গের জন্য অহিফেনসেবীর মতো অলঙ্ঘনীয় আকর্ষণ অনুভব করেছি। অন্তত প্রকাশ্যে, তিনি ছিলেন সদাহাস্যময়, এবং হাসি এমন সংক্রামক ছিলো যে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের মতো মলিন মুখও ঐ সূর্যের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করা মাত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দৌহিত্রের মৃত্যুসংবাদ যেদিন পৌঁছল, সেরাত্রে তিনি এক পূর্ব-নিমন্ত্রিত বিদেশী অতিথিকে ভোজ-সভায় সঙ্গদান করেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও ভদ্রলোকটি সন্দেহ করতে পারেননি যে সেদিনই রবীন্দ্রনাথের জীবনে কী নিদারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে। সুধীন্দ্রনাথের উচ্চতান সুখকেও, সুখ নয় সুসভ্য সংযম বলে মনে করি। তিনি যদিও জানতেন যে প্রলয় আসন্ন তবুও ডুবন্ত জাহাজের অধ্যক্ষের মতো স্থিরচিত্তে প্রত্যেকটি আচার-অনুষ্ঠান পালন করাটাকে, উচিত না হোক, সুরুচি বলে মনে করতেন। বধ্যভূমিতে সংযম ও বীরত্বের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না; বরং একমাত্র ফাঁসির মঞ্চেই দণ্ডিত ব্যক্তির হাসি অর্থপূর্ণ। কবি সুধীন্দ্রনাথ তো বটেই, মানুষ সুধীন্দ্রনাথও যে ব্রহ্মাণ্ডকে অর্থহীন ভেবেছিলেন, তার সঙ্গে কোনো সন্ধিস্থাপন তিনি করেননি। তাঁর সামাজিকতা, তাঁর অবিদ্রোহ, তা-ই এই হৃদয়-ও-নিয়মহীন জগতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম বিদ্রোহ—প্রচণ্ডতম, কারণ এর মধ্যে মৃত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নেই, ক্রন্দন নেই, আছে শুধু এই জগতের অসীমতার সঙ্গে প্রতিযোগিতার উপযোগী সাহস। প্রকৃতির কোথাও কোনো ভব্যতার বালাই নেই; বাঘ যখন হরিণীকে আক্রমণ করে তখন সে বলে না আমায় আপনি ক্ষমা করুন; শুধু মানুষ কৃত্রিম আচারের মধ্য দিয়ে স্বভাবকে বুদ্ধির বশবর্তী করেছে। জগতে সব-কিছু আসলে বিশৃঙ্খল;

বন্ধন আছে, কিন্তু অর্থ নেই, বরফ গলে জল হয় কারো সুচিন্তিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বলে নয়, বরফ তার প্রকৃতি অতিক্রম করতে পারে না বলে। প্রথানির্দিষ্ট, সুশৃঙ্খল, ছন্দোবদ্ধ, মিলযুক্ত, অবিদ্রোহী কবিতা জগতের বিপরীত, কেননা কবিতায় নিয়ম উদ্দেশ্যময়। জগতের সব-কিছুই যে আকস্মিক, যেন তারই প্রত্যুত্তরে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের সব-কিছুই সুচিন্তিতভাবে নির্মাণ করেছিলেন।

মানুষের রচনাশক্তিকে তিনি কি অতিরিক্ত মূল্য দিয়েছিলেন? সত্যই জগৎ যদি অর্থহীন হয়, তবে মানুষ কীভাবে জগৎকে অর্থদান করতে পারে? আর যদিই বা সে পারে, তাহলে কি এই প্রমাণ হয় না যে জগৎ অর্থপূর্ণ কারণ মানুষ জগতেরই অংশ? সুধীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কে এই সকল কূট প্রশ্ন আবু সয়ীদ আইয়ুব উত্থাপন করেছেন। আশ্চর্য এই যে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠকালে এই সকল প্রশ্ন—যা মানতেই হবে প্রণিধানযোগ্য—আমাদের বিন্দুমাত্র চিন্তিত করে না। যে-বিপুল সংগঠনপ্রতিভা 'অর্কেস্ট্রা'র মতো কবিতাকে সংহত করতে পারে তা ঐশ্বরিক বলে মনে হয়। হ্যাঁ, আমরা বলতে বাধ্য হই, এই ক্ষমতার দ্বারা সবই সম্ভব, এমনকি জগৎ-নামক হিম শবে প্রাণদানও সম্ভব।

সুধীন্দ্রনাথের গঠনপ্রতিভা সামান্য এক ভোজসভাকেও এক শিল্পকর্মে পরিণত করতে পারত: যেমন সকারণে পঙক্তির পর পঙক্তি কবিতায় গ্রথিত করতেন তেমনি সুকৌশলে তিনি অতিথিদের পঙক্তিনির্দেশ করে দিতেন; বিরোধী চিত্রকল্পের মতো ভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিদের একত্র করতেন; এবং কথার সলতে নিবন্ত হলে তাকে উস্কে দিতেন—কবিতায় এক বিস্ময়কর মিলের মতো—এমন কোনো অপ্রত্যাশিত কথা বলে, উপস্থিত ব্যক্তিরা সমস্বরে যার প্রতিবাদ না করে পারতেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাকে যথাযথ বলে স্বীকার করতে বাধ্য হতেন। এবং যে সাহিত্যিক বিপ্লবের তিনি নায়কত্ব করেন তার গতিও একান্তভাবে তাঁরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। 'পরিচয়' সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত রচনাকে শুধু একত্র করতেন না, আসলে তিনিই ছিলেন রচয়িতা, অপর লেখকেরা এই স্থপতির হাতে মালমশলা জুগিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। 'কল্লোল' ও 'পরিচয়'-এর মধ্যে যে-বৈষম্য বুদ্ধদেব বসু লক্ষ্য করেছেন তারই প্রতিধ্বনি করে বলা যায় 'কল্লোল' ছিল তার লেখকবর্গের বাহনমাত্র, আর 'পরিচয়' তার লেখকগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করেছিল। 'কল্লোল'-এর সম্পাদক ছিলেন আত্মবিলোপকারী সাহিত্যসেবী, এমন এক সিঁড়ি, যাকে পিষ্ট না-করে উপরে ওঠা যায় না— অপরিহার্য, কিন্তু তার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। অন্য দিকে 'পরিচয়ে'র সম্পাদক ছিলেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অহংবাদী, এবং তিনি সাহিত্যসেবী শুধু নন, তিনি সাহিত্যিক, তিনি স্রষ্টা।

সুধীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'পরিচয়'-পর্যায় প্রমাণ করে যে তিনি বাংলাদেশের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলন। তিনি মুখে বলতেন যে বঙ্গোপসাগরের গর্ভ থেকে উৎপন্ন এই শ্যামল মৃত্তিকাখণ্ডটিকে যদি আবার সমুদ্র গ্রহণ করে তবে তিনি বিশেষ বিচলিত হবেন না। যেমন তীব্র আবেগবান প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয়পিপাসায় আর্ত হয়ে একযোগে তার মৃত্যু ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করে, তেমনি

সুধীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে এতটাই ভালোবেসে ছিলেন যে আমাদের বর্তমান অধঃপাতের চাইতে লুপ্তিই শ্রেয় বলে তাঁর মনে হয়েছিল। তিনি নিজেকে যতই জীবনবিয়োগী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করুন না কেন, তাঁর চেষ্টার তীব্রতাই বুঝিয়ে দেয় যে তিনি নিস্পৃহ নন, একক মুক্তি কাম্য নয় তাঁর। সংসারকে মায়া জেনেও আচার্য শঙ্কর যেমন আত্মগোপন করেননি, মায়াপাশবদ্ধ কিন্তু প্রিয় সংসারীর জন্য প্রচারকার্যরূপ মায়ায় নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথও নিজেকে শূন্যবাদীরূপে প্রচার করেছিলেন বটে কিন্তু বাঙালী পাঠককে নেহাত শূন্যমাত্র বলে ভাবেননি, তার চিত্তের উন্নতির জন্য পত্রিকার সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছিলেন। মালার্মে যে-ধরণের কবিতা লিখতেন তার অনেকগুলিই অবোধ্য বলে তাকে হয়তো নিষ্কাম কর্ম বলা যেতে পারে, কিন্তু একটি পত্রিকা— বিশেষত 'পরিচয়'র মতো গদ্যবহুল পত্রিকা— প্রচারের অস্ত্রবিশেষ, লোকচিত্তে প্রভাববিস্তার তার মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশহিতের সংজ্ঞার্থ অনেক; কিন্তু যদি মননকে অনুপ্রাণিত ও রুচিকে সংশোধিত করা নিতান্ত নিস্প্রয়োজনীয় না হয়, তবে স্বীকার করতেই হবে গৌড়কুলবিদ্বেষী বলে যিনি নিজেকে চিত্রিত করেছিলেন তিনি আসলে ছিলেন নৈষ্ঠিক বঙ্গপ্রেমী ও দেশ-হিতৈষী —কারণ 'পরিচয়ের' মতো পত্রিকা বাংলাদেশে আগে ছিলো না, পরেও হয়নি —যাঁর তুলনায় জীবনানন্দ—যিনি আমাদের দুর্ভাগ্যবশত 'রূপসীবাংলা'র কবিরূপে চিহ্নিত হচ্ছেন—তাঁকে মনে হয় হিমালয়বাসী সন্ন্যাসীর মতো আত্মকেন্দ্রিক ও স্বমুক্তিকামী।

এবং শুধু বাংলাদেশ নয় সারা চরাচরের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের বিরাগ আসলে তাঁর প্রেমেরই নিদর্শন। মালার্মের এই শিষ্য, অযোগ্য বলে নয় মহৎ বলেই গুরুমার্গে গমন করেননি। যে-সুস্পষ্ট কয়েকটি লক্ষণ মালার্মেপন্থীদের চিহ্নিত করে, তার একটিও সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে উপস্থিত নেই। সুধীন্দ্রনাথ এই জগৎ সম্পর্কেই কবিতা লিখেছিলেন, কবিতা সম্পর্কে নয়। আর, আত্মসর্বস্ব ধ্বনিমাত্র নয় তাঁর কবিতার ভাষা, তা জগতের প্রতি আমাদের মনোযোগ-সঞ্চালনকারী প্রতীক। ভাবের যথাযথ প্রকাশকেই তিনি শব্দচয়নের উদ্দেশ্য বলে ভেবেছিলেন; অর্থরূপ সূক্ষ্ম লক্ষ্যকে তাঁর শব্দগুলি নিপুণভাব ভেদ করে, তাকে কুয়াশায় পরিণত করে না। এবং—হায়, মালার্মে-ভক্তগণকে নিরাশ করতে আমি বাধ্য হচ্ছি—সুধীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান, প্রায় একমাত্র, বিষয় প্রেম; না, ঈডিপসীয় গূঢ়ৈষণা নয়, প্রেমের মুখোশধারী কোনো কৃষ্ণ অপদেবতার তত্ত্ব নয়, তাঁর কবিতার বিষয় হচ্ছে সেই অতিপরিচিত অনুভূতি, যার নাম প্রেম!

ঐ বাক্যের শেষে বিস্ময়বোধক চিহ্ন দেখে কোনো পাঠক অবাক হবেন না নিশ্চয়। আধুনিক কবিগণ মদনভস্মে জগতের সব-কিছু ঢেকে দিয়েছেন; মানব-মানবীর কল্লোলিত ও জীবনদাত্রী প্রেমস্রোতকে শব্দ ও তত্ত্বের কচুরি-পানাব তলায় আত্মগোপন করতে বাধ্য করেছে; আর, একদিকে মানুষকে যেমন তাঁরা প্রেমের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন, তেমনি অন্যদিকে সকল প্রাণীর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন যৌন গূঢ়ৈষা, সকল অচেতন বস্তুর মধ্যে যোনিমূলের প্রতীক। ইয়েটস ছাড়া

অন্য কোনো আধুনিক ইওরোপীয়ের কবিতায় প্রেম নেই, আছে কাম—তাও প্রচ্ছন্নভাবে, ছদ্মবশে। আর সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেমের প্রকাশ অলজ্জ; এমনকি এও বলা যায় যে তাঁর কবিতায় প্রেমিকেরা আবেগকে 'প্রকাশ' করে না, তীব্র আবেগে দীর্ণ হয়ে তারা আর্তনাদ করে ওঠে। "যার ওদিকে অনিশ্চয় আর এদিকে বেদনাপ্রভব কল্পনা" —সেই প্রতীক ব্যবহার করা তো দূরের কথা, এমনকি চিত্রকল্প ও মধুর ধ্বনিকে মনে হয় তাদের আবেগের নগ্নতাকে গোপন করার অলংকার, তাদের মনের কথা ঢাকার আচ্ছাদন। প্রেমের চরম মুহূর্তে কোনো কাব্যকৌশলই সহ্য হয় না তাদের, তখন তারা দ্ব্যর্থতাহীন, খাঁটি, দেশজ বাংলায়— অর্থাৎ তাদের প্রাণের ভাষায়— চিৎকার করে ওঠে, ছিঁড়ে ফেলে চিত্রকল্পের ভারি পর্দা, পাঠকের সামনে উন্মোচন করে তাদের নগ্ন ও স্পন্দমান আরক্তিম হৃদয়।

মালার্মে-কল্পিত কামগ্রস্ত ফনের সঙ্গে 'সংবর্তে'র প্রেমিকের প্রতিতুলনা করার প্রলোভন সামলাতে পারছি না। দুজনেই নিজেদের প্রেমাস্পদের বিরহে কাতর, দিবাস্বপ্ন ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। 'সংবর্তে'র নায়িকা "রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উদ্ভাসে লাক্ষণিক"; আর মালার্মের অপ্সরীদ্বয় তো স্বপ্নমাত্র। মালার্মের কবিতার অন্তিম পঙক্তিতে অপ্সরীরা মৃত্যুর অনিশ্চিত ও অন্ধকার প্রদেশে প্রত্যাবর্তন করে :

যমলা, বিদায়!
আমাকে সে-ছায়া ডাকে তোমাদের লুপ্তি যে-দ্বিধায়॥

'সংবর্তে'র শেষে একই "প্রতর্ক"ময় রাত্রি নেমে আসে; মুহূর্তের জন্য সন্দেহ জাগে যে এই নারীও কেবল দিবাস্বপ্ন কিনা:

মৃত স্পেন, ম্রিয়মাণ চীন,
কবন্ধ ফরাসীদেশ, সে এখনো বেঁচে আছে কিনা।
তা সুদ্ধ জানি না।

কিন্তু পলকে সে-সন্দেহ ভেঙে যায়। হায়। ফনের অপ্সরীগণের মতো এই নারীও কেন কল্পনার পুতুলমাত্র হলেন না, প্রশ্ন করেন আর্ত পাঠক। যিনি এমন চিহ্নহীনভাবে দূরে সরে গেছেন তিনি শুধু ছায়া হলেই বরং ভালো ছিল। কিন্তু যাঁর স্মৃতিমাত্র দিয়ে এই সংসারী ও সংশয়ী, বিদগ্ধ এবং উত্তরচল্লিশ প্রেমিক জগৎব্যাপী সংবর্তের মধ্যে স্নিগ্ধ এক নিশ্চিন্ততার দ্বীপ রচনা করে নিতে পারেন, সেই নারী এককালে শুধু জীবিত ছিলেন না, জীবনদাত্রীও ছিলেন। তাঁর ঐ জ্বলন্ত বাস্তবতাই শেষ পঙক্তিকে পরিণত করে আর্তনাদে।

আর মালার্মের অপ্সরীদের জন্ম ফনের কল্পনায়। তাদের লুপ্তির পরেও অবশিষ্ট থাকে সেই কল্পনা, এবং যেমন প্রাণহীনতাও প্রাণের কারণ হয়, গলিত শব ভক্ষণ করে পুষ্ট হয় কীট, তেমনি শিল্পজ অপ্সরীদের শূন্য স্থানে গজিয়ে ওঠে নতুন প্রেতেরা, ঐ কুমারীদ্বয়ের অভাবে ফনের উদ্ভাবনশক্তি ক্ষয়িত না-হয়ে বরং বৃদ্ধি পায়। হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করি যে এই চতুর দেবপশু—প্রেম নয়, প্রেম-প্রেম খেলা

খেলছিলেন। কোনো নারী যা পারেন না, এই শিল্পীটি তা-ই পারেন— তাঁর চিদাকাশে একটু বাতাস উঠলেই রং বদলায়, আর তাঁর কামনা তৎক্ষণাৎ নতুন রঙের আরেকটি পুতুল গড়ে। এই অর্থহীন জগৎ অকারণে সারাক্ষণ নানা তরঙ্গ বিকিরণ করছে; ভাগ্যিস এই শিল্পীপ্রবর ছিলেন, তাই এই তরঙ্গগুলি কাজে লাগল, অর্থ পেল, কারণ জড়ত্বের এইসব শিহরনকে সংযুক্ত ও রূপান্তরিত করে শিল্পীশ্রেষ্ঠ ফন কখনো অপ্সরী, কখনো দেবী ভেনাসকে নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য রচনা করে নেন। ঐ ফন স্বাধীন চৈতন্যের প্রতীক; 'সংবর্তে'র নায়ক আর্ত হৃদয়ের। মালার্মে সারা জগৎকে কবিতার উপকরণ বলে ধারণা করেছেন; এই নিঃস্বতা থেকে যেহেতু কাব্যের মুক্তো তুলে আনা যায় সেহেতু এই শূন্যতা তাঁর পক্ষে বিজয়গর্বের কারণ, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কাছে বিলাপের। সুধীন্দ্রনাথ স্বয়ং মালার্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নির্দেশ করে গেছেন দুই অবিস্মরণীয় পঙক্তিতে। তার স্বপ্নভঙ্গের পর ফন পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে,

প্রতর্ক, প্রাক্তন রাত্রি, সাঙ্গপ্রায়।

আর সুধীন্দ্রনাথের এক নায়ক, কোনো নারী সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে আর আসবে না জেনে, বিলাপ করে,

সমাপ্ত সংরক্ত রাত্রি, চূর্ণমুষ্ঠি ধূলিধূসরিত॥

মালার্মের কবিতা বর্ণহীন, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা হার্দ্য ও সংরক্ত। ঈশ্বর নেই– জগৎ স্বপ্নমাত্র– এ-কথাটা মালার্মের বুদ্ধিকে সুড়সুড়ি দেয় বটে কিন্তু তাঁকে চিন্তাকুল করে না। আর, সুধীন্দ্রনাথকে তা শুধু ভাবিত করে না, বিদীর্ণ করে। তিনি নিজেকে জগতের ভাগ্যের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করেছিলেন যে হিটলার ও স্টালিনকে উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, পারেননি তিনি অন্যায়ের জয়যাত্রায় অবিচলিত থাকতে; এবং তাই এক নারী-স্মৃতি, সামান্য এক মানবকন্যার স্মৃতি দিয়ে ঈশ্বরেব শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু নারীটিকে দেবীতে পরিণত করেননি। বাংলা কবিতার ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমাদের প্রেমের কবিতার আবিষ্কারক বৈষ্ণব কবিগণ মানবীকে দেখেছিলেন দেবীরূপে। তাঁদের প্রতি ভাগ্য ছিলেন প্রসন্ন, কারণ আমাদের ইতিহাসের ঠিক ঐ মুহূর্তটিতে দেবতা তীব্রভাবে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। রাধাকৃষ্ণের চরিত্রে মানুষের চিরকালের পিপাসা নররূপ ধারণ করল; গত যুগের দেবতারা হয় স্পষ্টতই অতিমানবিক, নয়তো— যেমন কালী বা গৌরী— মানুষের কোনো-একটি বিশেষ বাসনা বা বেদনার পরম রূপক; কিন্তু কৃষ্ণ—কর্মী, শিল্পী ও প্রেমিক; পরম শিশু, দুরন্ত কিশোর, উদ্দাম প্রেমিক ও সফল রাজা— মানুষের সকল ইচ্ছার সন্নিপাতে গড়া একমাত্র পূর্ণ মানুষ। রাধাকৃষ্ণকে এমন একটি দ্রাক্ষার সঙ্গে তুলনা করা চলে যার মসৃণ নীলকান্ত ত্বক ঐশ্বরিক বটে, কিন্তু যার অন্তরে আছে মানবিক রক্তমাংসের আকৃতি। আর বৈষ্ণব কবিতায় দেবী যদি মানবীরূপ ধারণ করে থাকেন, রবীন্দ্রনাথ মানবীকে দেবীতে পরিণত করলেন। যৌবনে, অল্প কয়েক বৎসরের জন্য,

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নারী ধরা দিলেন—ঠিক আমাদের পরিচিত কোনো মহিলা তিনি নন, কিন্তু স্পষ্টতই তিনি মানবকন্যা। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের শেষে, ধীরে-ধীরে, রহস্যের কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ল, অস্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর কাব্যবর্ণিত স্থান, কাল হলো অতীত কিংবা অনন্ত, পাত্রপাত্রী লোকোত্তর। তাঁর মানসী দেবীগণ এমন রহস্যে আবৃত্ত যে তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না—প্রকৃত দেবী? কাব্যলক্ষ্মী? সাধারণ নারী?— কিন্তু এটা লক্ষ্য করা যায় যে তাঁদের দেহের যে-একটি অংশেব উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেন, তা হলো তাঁদের চোখ—মানুষের দেহের মধ্যে যা সবচেয়ে দিব্য। রবীন্দ্রনাথের এই দেবীগণ শীতল এবং অচঞ্চল; তাঁদের চরণে আত্মসমর্পণ করতেই হয়, কিন্তু কখনোই উদ্দেশ্য বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না; এঁরা প্রেতিনী-যোগিনী নন বটে, কিন্তু কে জানে এঁরা মানুষের শুভকামী কিনা; অর্থাৎ এঁরা বোদলেয়ারের জগতের অধিবাসী না-হলেও, কীটস এঁদের অস্পষ্ট ছায়া দেখেছিলেন। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের এই দেবীগণের তুল্য কিছু বিশ্বসাহিত্যে নেই, কেননা কীটস যদিও পৌত্তলিক হবার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি রক্তে-রক্তে ছিলেন খ্রীস্টান; আর রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের আবহমান পৌত্তলিকতা তাঁর কল্পনাকে আচ্ছন্ন করেছিল। এই দেবীগণ চিরকাল কল্পনা ও বাস্তবের সন্ধিস্থানে বাস করবেন, কারণ বিশ্বের সকল কুয়াশা, সকল রহস্য— অদৃশ্য, অস্বচ্ছ, স্পর্শাতীত যা-কিছু-পুঞ্জিত হয়ে শুভ্র ও হিম মূর্তিদের রচনা করেছে, যে-জলকণা বাতাসে মিশে ছিলো তাকে দেহ দিয়েছে। ক্রমে তাঁর কবিতায় আর এক নারী জন্ম নিল, যে ঐ মনোমোহিনীর বিপরীত—সে ব্যথিত, কম্পিত, লজ্জাভারে অবনত, সে কবি স্বয়ং। এবং তার জন্মমুহূর্তে মানসসুন্দরী জীবনদেবতায় পরিণত হলেন; 'ভ্রষ্ট লগ্ন' কবিতায় যে-নারীর কণ্ঠ প্রথম শোনা গেল, দীর্ঘ আট বছর ধরে তাকে আত্মগোপন করতে কবি বাধ্য করলেন, কিন্তু 'খেয়া'য় তাকে আর সংযত রাখা গেল না, সেই দেবপ্রেমে উন্মাদিনী স্বীকার করল যে সে ঈশ্বরেরই প্রেমে পড়েছে। মানব-মানবীর প্রেম রবীন্দ্রনাথ যে এর পর একেবারেই চিত্রিত করেননি তা অবশ্য নয়, কিন্তু প্রবীণ কবি যে কয়েকটি কবিতায় নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ বর্ণনা করেছেন তার ভঙ্গি হয় চপল—যেন প্রণয় নামক ব্যাপারটায় তিনি আর বিশ্বাস করেন না—অথবা তত্ত্ব ও ভাবালুতার রসায়নে নারীর অস্থিমাংস উবে গিয়ে নাম কিংবা স্মৃতিটুকু শুধু পড়ে থাকে।

এ-কালের ভদ্রমহিলাকে প্রথম কবিতায় স্থান দিলেন আধুনিক কবিরা; কবিতার মানচিত্রে বিদিশার পাশে নাটোরের নাম খোদিত হলো। কিন্তু বনলতা সেন নামেই শুধু আধুনিক, আসলে তিনি সর্বকালের। সকল নদীর অন্তে তাঁর অধিষ্ঠান; সকল মানুষ নাবিকের মতো সমুদ্রে-সমুদ্রে ভ্রমণ করে শেষে তাঁর চোখের নীড়ে প্রত্যাবর্তন করে। জীবনানন্দের নায়িকারা দেহকে উষ্ণ করে না, বরং উষ্ণ হৃদয়কে শীতল করে। জীবনানন্দ যদিও 'অশ্লীলতা'র জন্য কর্মচ্যুত হন, তাঁর কবিতার কোথাও, যতদূর মনে পড়ছে, চুম্বন শব্দটি ব্যবহার করেননি। এই শব্দটিকে পরিহার করার কারণ নিশ্চয় তার ব্রাহ্মিকতা নয়, তার কারণ তাঁর মানসকন্যাদের চরিত্র। কল্পনার ছায়াদের

তো আর চুম্বন কিংবা আলিঙ্গন করা যায় না!

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যকন্যারা মানুষ; মানুষ শুধু নন, তাঁরা এ-যুগের; এবং এ-যুগের শুধু নন, তাঁরা এক বিশেষ সামাজিক পরিবেশে লালিত। তাঁদের জিবের ডগায়—হয়তো—বিদেশী ভাষা, হাতের আগায়—নিশ্চয়ই—টেলিফোন। এঁরা কেউ-কেউ বিদেশিনী, এবং সকলেই বহুপ্রণয়ে অভিজ্ঞা। কেউই কিশোরী বা অপাপবিদ্ধা নন। এবং নায়কেরা বিগতযৌবন, গলকম্বলের ভাঁজে হারিয়ে গেছে তাঁদের চিবুক, ক্ষীণকেশ ও সুবেশ। অর্থাৎ, সেইসব উপেক্ষিত মানুষ যাঁরা প্রেম নামক নাটকে শুধু আশীর্বাদ ও সম্প্রদানের জন্য প্রবেশ করতেন, তাঁরা রক্তমাংসের দেহ নিয়ে সুধীন্দ্র-কব্যের মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

সুধীন্দ্রনাথেব কাব্যে প্রেম স্পষ্টতই মানবিক আত্মজৈবনিক। কোনো-কোনো কবিতা শুধু তীব্রতা নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খের বর্ণনার জন্যও একেবারে বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। চণ্ডীদাসের পদাবলী কোনো-এক রজককন্যার উদ্দেশ্যে রচিত; কিন্তু ভারতীয় মনের দোষ কিংবা গুণই এই যে তা ঐতিহাসিক ঘটনাকেও পুরাণে পরিণত করে, এবং বৈষ্ণব কবিও তাঁর কাব্য থেকে স্থানীয় ও তাৎকালিক সমস্ত-কিছুর চিহ্ন এমনভাবে বিলুপ্ত করেছেন যে সেই মানবকন্যা—যিনি হয়তো ঐ রোমাঞ্চকর কবিতাগুলির মূল কারণ—বেঁচে আছেন শুধু লোককল্পনায়। পশ্চিমী সাহিত্যে ঠিক এর বিপরীতটি ঘটে; ব্যক্তি ও ইতিহাস কখনো-কখনো কবিতার ছদ্মবেশ ধারণ কবলেও অনন্তকালের সঙ্গে মিশে যায় না; এবং, টিশিয়ানের দ্বারা অঙ্কিত ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতির মতো, এমন কবিতাও ইওরোপে রচিত হয়েছে যাকে কবি ও কবিতার নায়কের (বা নায়িকার) যৌথ সৃষ্টি বলে অভিহিত করা সম্ভব। সুধীন্দ্রনাথ ভারতীয় কবি; তিনিও তাঁর জীবনের ঘটনাকে পুরাণের মুখোশ পরিয়েছিলেন; কিন্তু একমাত্র তাঁরই কবিতায় এমন অনেক সংকেত আছে যা থেকে বোঝা যায় তাঁর জগতে এমন অনেক-কিছু ঘটে গেছে যার দীর্ঘায়িত প্রতিচ্ছায়ায় তাঁর কবিতা অনুরঞ্জিত।

উপরন্তু লক্ষণীয় যে এই মালার্মে-ভক্ত বাঙালী কবির রচনায় ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর জীবন এক হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক তথ্যে এতদূর পর্যন্ত সমৃদ্ধ কবিতা অন্য কোনো বাঙালী কবি রচনা করেননি। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় মানুষের অন্তর্জীবন ও সামাজিক অভিজ্ঞতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে গেছে; এবং তিনি রাষ্ট্রিক দুর্যোগকে ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর কোনো-কোনো কবিতার প্রধান উপকরণ এমন ঘটনা যা সারা বিশ্বকে স্পর্শ করে, কিন্তু যাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তীব্রতা নেই, যা খবরের কাগজের অধিকাংশটা জুড়ে থাকে কিন্তু আমাদের স্বপ্নে স্থান পায় না, যার সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া চলে কিন্তু কখনো যা নিয়ে ফিসফিস করে আমরা কথা বলি না। সুধীন্দ্রনাথ নীরস রাজনীতিকে কোমল ও সুপাচ্য করলেন তাকে প্রেমের রসে জারিত করে; তার কবিতারূপ উপাদেয় ব্যঞ্জনে রাজনৈতিক উপাদান আছে প্রচুর, কিন্তু তার লবণ বা লাবণ্য নারী ভিন্ন আর-কিছু নয়। তিনি আবিষ্কার করলেন রাজনীতিতে নীতি নেই, ইতিহাসে নেই নিয়ম, হৃদয় নেই জগতে:

এই শূন্যতার মধ্যে নারীই পুরুষের একমাত্র সহচর। হতে পারে সে প্রেম অমর নয় এবং বিচ্ছেদ অনিবার্য কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য অন্তত নারী ও পুরুষ পরস্পরের শূন্য হৃদয় ভরে দিতে পারে।

তোমর প্রাণের পরতে পরতে
যে-অনাম তৃষা গুমরি কাঁদে
অনুকম্পায়ী জীববীণা মোর
ঝংকৃত আজ সে অনুনাদে।—
নিত্য জ্বালার কলুষকালিমা
জানি; তাই হিয়া দরদে কাঁদে॥ (প্রতিদান)
হেন কালে
অমৃতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে,
তুমি এলে অনাহুত প্রেতস্তব্ধ গৃহে;
চির মোহ-ময়
তুচ্ছ প্রয়োজনহীন বাক্য-কতিপয়
চুম্বনের অবকাশে মৃদু স্বরে উচ্চারণ করি
দিলে ভরি
নিরিক্ত অন্তরে মোর আকাঙ্ক্ষার সহজ বিস্ময়।—
তবু ক্ষুদ্র প্রেমের উপরে
নিশ্চিন্তে নির্ভর পেল অনশ্বর মুহূর্তের তরে
তুলাসাম্যহৃত বিশ্ব প্রলয়ের পথে॥ (পুনর্জন্ম)

সুধীন্দ্রনাথের আদি ও শেষ কবিতার মধ্যে যে-বিপুল ব্যবধান লক্ষিত হয় নারী তার অন্যতম কারণ। আদি রচনাগুলিতে নারীই মঞ্চের সবটুকু জুড়ে থাকে; এবং শেষ রচনায় তার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত মুছে গেছে, জগতের অর্থহীনতাই কবিতার একমাত্র বিষয়। প্রথমদিকের কবিতার কৌশল কাঁচা, ভাবনাও হয়তো নতুন নয়। শেষ কবিতাগুলি রচনাগুণে শ্রেষ্ঠ এবং ভাবনাগুণে গভীর। কিন্তু প্রথমদিকের কবিতাগুলিতে যদি আর্দ্রতার আধিক্য থাকে, তবু সরসতার গুণে তাদের জয় অবধারিত। 'সংবর্ত' -পরবর্তী কবিতার কলাকৌশলের তারিফ না-করা অসম্ভব, কিন্তু চিত্রকল্প তেমন আর সজীব নেই; ঐ শূন্যতাকে মেনে নেবার মধ্যে যে বীরত্ব আছে তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তার সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারি না। এই সুনির্মিত কবিতাগুলি এক জ্ঞানী ও নিঃসঙ্গ নীতিবোধের আবাস; তাই হয়তো তাদের পাষাণাচ্ছাদিত অঙ্গনে কল্পনার কোমল শিশুরা কলরব করে না, কোনো চপল, নীতিজ্ঞানহীন প্রজাপতি এখানে আসে না বলে স্ফটিকের সুন্দর বাগান নিস্পন্দ। প্রথমদিকের রচনা মধুর ও ঘন; আর তাঁর শেষ রচনায় তাঁর জগৎ নাস্তিময় ও কঠিন। 'সংবর্ত'-কবিতায় এই দুই বিপরীত পরস্পরের অভাব পূরণ করেছে, টিনের খাপে কুলপির মতো জগতের শূন্য আধার ভরে দিয়েছে নারী। এই কবিতাটি সকল অর্থেই তাই সুধীন্দ্র-কাব্যমালার মধ্যমণি।

জীবনানন্দের কবিতায় সর্বকালের নারী নিতান্তই আধুনিক বেশবাস ধারণ করে,

আর সুধীন্দ্রনাথ এমনকি আধুনিক বিদেশিনীকে কালিদাসের অলংকারে সাজান। এছাড়া হয়তো অন্য উপায় ছিলো না এই দুই কবির। মুখ যার শ্রাবস্তীর কারুকার্য আর চুল যার বিদিশার নিশা তাকে বিশ্বাস্য করে তোলা কঠিন, নিকট করা প্রায় অসম্ভব। এই অসম্ভবকে জীবনানন্দ সম্ভব করলেন কোলরিজের মতো কল্পনাকে বাস্তবের মুখোশ পরিয়ে, চিরকালকে বর্তমানের কৌটোয় ভরে ফেলে। বিদিশার পর নাটোর? অন্যত্র এই দুটি নামের সংযোগ, নাটোরবাসীদের কাছে ছাড়া, কার না মনে হবে হাস্যকর? অথচ এই দুঃসাহসী কবি বিদিশাক নাটোরের সঙ্গে এমনভাবে পরিণীত করেছেন যে এখন আমরা স্থির করতে পারি না এই সংযোগের ফলে কে অধিক সম্মানিত হলো। এটুকু স্পষ্ট যে বর্তমান নাটোরর সঙ্গে ঘর্ষণে মৃত বিদিশা আমাদের কল্পনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছ, হয়ে উঠেছে ঘনিষ্ঠ, এবং সেহেতু মর্মস্পর্শী। জীবনানন্দের অধিকাংশ শব্দ দেশজ ও যুক্তাক্ষরবিরল, অর্থাৎ তা আমাদের হৃদয়নামক অশিক্ষিত ও সরল শিশুটির আপন ভাষা। আর তাঁর চিত্রকল্প কোনো স্বেদমলগন্ধময় প্রাণীর মতোই জীবন্ত। যাকে প্রতীক বলে জানলে আমরা নিরুৎসাহ বোধ করতাম, এখন তার শরীরের দ্বারা আকৃষ্টই শুধু হই না তার মধ্যে অন্য-কিছুর দ্যুতি দেখে পুলকিত হই।

আর অতি ঘনিষ্ঠকে কাব্যের উপযোগী দূরত্ব দান করলেন সুধীন্দ্রনাথ। সংস্কৃত ভাষা থেকে অসংখ্য শব্দ এবং নানা দেশের সাহিত্য থেকে অনেক কৌশল তিনি শিক্ষা করলেন; স্বেদগন্ধ প্রসাধনের তলায় চাপা পড়ল। কবিতা থেকে যে-রস রোমান্টিকেরা বিতাড়িত করেছিলন, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় আবার তা সপ্রলিত হলো—ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তিকে তিনি গম্ভীরতম কবিতায় স্থান দিলেন। কাব্যে বহুকাল বিষাদ ছিলো সম্রাট, এতদিন পরে সভাসদ দরবারে ফিরে এলো। কালিদাস ও ফরাসী আঠারো শতকের কবিদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা শুধু মৌখিক ছিলো না, তাঁদের তথ্যাশ্রয়িতা ও পৌরুষ সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়ও বর্তমান। রোমান্টিক কবিদের নায়িকাদের আকার কৃশ ও পাণ্ডুর; তাঁদের শরীর কুয়াশার মতো আবছায়া। সুধীন্দ্রনাথ কালিদসের যক্ষের মতো পরিণতবয়স্ক, এবং ইন্দ্রিয়নির্ভর। তিনি প্রসাধন ও অলংকার ভালোবাসেন, কিন্তু তিনি কোনো প্রথম প্রেমবিগলিত বালক নন, তাঁর প্রেমিকা স্বেদ ও রোমরাজিহীন কোনো স্বপ্নপ্রায় নারী নন। 'শাশ্বতী' কবিতার কোনো-কোনো পঙক্তিতে সংস্কৃত সাহিত্যের যে প্রতিধ্বনি শোনা যায় তা প্রক্ষিপ্ত নয়, তা তাঁর কবিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কিন্তু তেমনি অবিচ্ছেদ্য তাঁর রোমান্টিক পঙক্তিগুলি। 'শাশ্বতী'র শেষ স্তবকে প্রকৃতি মানবহৃদয়ের সংবেদী মুকুর হয়ে উঠল; বিরহী রামচন্দ্র যেমন অরণ্যের সর্বত্র সীতার চিহ্ন দেখেছিলেন, এই প্রেমিকও তেমনি তাঁর প্রিয়ার ছায়া দেখেন প্রকৃতির মধ্যে। কিন্তু প্রথম স্তবকে প্রকৃতি কবির মনে বিচ্ছেদের বোধই জাগিয়ে তোলে; বাইরের জগতে কোনো অভাব নেই, প্রকিৃতির মিলনোৎসবে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে কিন্তু কবির নেই, কারণ শুধু তাঁরই হৃদয় সেই অন্য উৎসবের স্মৃতি ভুলতে পারেনি। প্রকৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত কবি জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন; এই

ধারণাটি কালিদাসে নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্তমান, আর, ইংরেজী কাব্যে ডিউক অর্সিনোর আগে কেউ এই কবিতার অর্থে 'উদাস' ছিল না।

মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকি;
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা;
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা।

আধুনিক কবির যে-ছবি বোদলেয়ার, মালার্মে ও ভালেরি রচনা করেছেন সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার কিছুই মেলে না। ভগ্নপক্ষ আলবাট্রস ও ইকারুস, তুষার হ্রদে বন্দী শ্বেত হংস এবং স্বচ্ছায়াবন্দী নার্সিসুস—এরা সকলেই নিষ্ক্রিয়তার ও চৈতন্যের ভারে পঙ্গু আত্মার প্রতীক। আর সুধীন্দ্রনাথ সাধনার ও সিদ্ধির প্রতিভূ, তিনি প্রতীক বীরত্বের। তাঁর কাছে প্রতীত হয়েছিল যে এই কোটি কোটি কণিকায় বিভক্ত জগৎ এবং সেই জগতের কয়েকটি ভগ্নাংশ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান, এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা ভগ্ন মানুষের হৃদয়কে আর কর্মের দ্বারা জোড়া দেওয়া যাবে না। রাজনীতির অশুভ ফল লক্ষ্য করে পিতার সামাজহিতৈষণাকে তাঁর নিজের পক্ষে বরণীয় বলে মনে হলো না। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের মতো তাই অস্ত্র ত্যাগ করে তিনি আশ্রয় নিলেন মন্ত্রের, জয় করলেন কাব্যদেবীকে, রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতার অন্তর্বর্তী এক স্বর্গ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো ত্রিলোকজয়ী— বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পকলার পরিণয় ঘটানো। যদি এ থেকে প্রথম দুটিকে আহুতি দিতে রাজি হতেন, তাহলে তিনি মালার্মে-ভক্তদের কাছে অধিকতর আধুনিক বলে গণ্য হতে পারতেন বটে, কিন্তু তাতে তাঁর বীরত্বের হানি হতো। তিনি যে আধুনিক কবিতার গুণগ্রাহী হয়েও সর্বলক্ষণসম্পন্ন "আধুনিক কবি" হননি, সে কি তাঁর বিফলতা? এটা সেই সব অজীর্ণরোগীর প্রশ্ন, যাঁরা ভোজসভায় শুধু দধির অন্বেষণ করেন, যাঁদের "আধুনিক কবিতা" নামক অতিশোধিত খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু হজম হয় না। হাইনে কেন গেওর্গে হলেন না? গ্যেটে কেন ডুইনো এলিজিস লেখেননি? পূর্বেকার কবিতার কেন আকার বৃহৎ, কেন বুদ্ধির আঁশ থেকে বিশুদ্ধ কবিতাকে নিংড়ে নেয়া হয়নি? কেন মহাভারত অত বিশাল ও বিচিত্র? কেন তা মালার্মের কবিতার মতো ছোট্ট একশিশি বর্ণহীন বিশুদ্ধ কোহল কিংবা উনগারেত্তির কবিতার মতো খাদ্যপ্রাণে ভরা তিলবৎ একটি বটিকা নয়? এ-সকল প্রশ্ন যাঁদের বিব্রত করে তাঁরা যদি এক কিংবা দুই শতক পরে আবার এ-জগতে ফিরে আসতে পারেন তবে দেখবেন যে আজ যা সহজ কথ্য বলে মনে হচ্ছে, তখন তা সুধীন্দ্রনাথের সংস্কৃতবহুল ভাষার চাইতে অনেক দূর ও দুর্বোধ্য হয়ে গেছে, আর বর্তমান 'আধুনিকতা'র আদর্শকে প্রাচীন ও বিলুপ্ত মতবাদ বিবেচনা করে গবেষকরা দুষ্পাঠ্য সব পুস্তক লিখছেন। খুব দূরের কথা সেটা? কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বিচারের পক্ষে দু-চার দশক বা দু-এক শতক বেশি কিছু নয়।

বিনয় মজুমদার

১. ব্যক্তি

বিনয় মজুমদার-এর কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ষাটের দশকের শুরুতে কোনো এক লিটল ম্যাগাজিনে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ফিরে এসো, চাকা'-র আড়াই পৃষ্ঠার এক রিভিউ-এর তিনটি কি চারটি উদ্ধৃতির বিদ্যুৎ চমকে।

তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে-দূরে

চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা। যে-যার ভূমিতে দূরে-দূরে আমার সকলেই। শুধু বৃক্ষ নয়। বিনয় মজুমদারের কবিতার বিষয় সেই ব্যবধান, বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতাবোধ ও মিলনেচ্ছা যা ফরাসী দার্শনিক পাস্কালের একটি সূক্তে আছে: আমি অনন্ত মহাকাশের কথা ভাবি, এবং ভয় পাই সেইসব অসীম বিস্তারের ধারণায় যেখানে আমার অস্তিত্বের ধারণাটুকু পর্যন্ত নেই।

শক্তির রিভিউ পড়ে মাটিতে বন্দী বিচ্ছিন্ন গাছের মতো, আমারও বিনয়কে দেখার শ্বাসরোধী কথা মনে এলো, কবিতার এমনই ক্ষমতা, কত দূর দূর থেকে ভেসে আসা পঙক্তির শিমুল তুলো বীজিত করে বন্দী, নির্বাসিত মন।

তখন আমার নির্বাসন ইংরেজী দৈনিক 'দ্য স্টেটসম্যান'-এর নিউজ ডেস্ক। এক বিকেলে পেয়াদাদের বাধা অগ্রাহ্য করে, মলিন গিঁট-দেওয়া পাৎলুন ও ঢোলা, ছেঁড়া জামায় আমার সামনে এক বিস্ময়কর মূর্তি হাজির। এই নেটিভ সমুদ্রে তখনও স্টেটসম্যান এক সাজানো-গোছানো শ্বেতাঙ্গ দ্বীপ। তার মধ্যে তো বটেই, কিন্তু এই ধুলোর কলকাতার পথেও, বস্তুত পৃথিবীর সর্বত্রই, ঐ মূর্তি বেমানান। কাপড়জামা পাগলের কি ভিখিরির, কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেবদূতের। আর আগন্তুকের হাসি?

মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বল্পকাল হাসে।

তথাকথিত মানসিক বৈকল্যের মেঘ বিনয়ের মাউণ্ট পালোমার দূরবীনের চেয়েও ক্ষমতাশালী চৈতন্যের আয়নাকে অধিকাংশ সময় ঝাপসা করে রাখে। সেই মেঘ চিরে একফালি আলো ঐ বিকেলে হেসেছিল।

'শুনলুম, আপনি আমাকে খুঁজছেন? আমি বিনয় মজুমদার।'

আমি ডেস্ক ছেড়ে উঠে, তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম।

ততদিনে আমি এক কপি 'ফিরে এসো, চাকা' সংগ্রহ করেছি তাতে ৮ই মার্চ, ১৯৬০, থেকে ২৯শে জুন, ১৯৬২-এর মধ্যে—কোনো ঘুমন্ত গিরির তিন-চার বার অগ্ন্যুৎপাতের মতো—কয়েকটি অবিশ্বাস্য ঝলকে-ঝলকে লেখা ৭৭টি কবিতা আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। এই মহাকবি সশরীরে আমার কারাগারের গারদ

ঝাঁকা দিলেন। কাজে তুড়ি মেরে, মেঘের উপর ভাসতে-ভাসতে, সেকালের চৌরঙ্গী রেস্তরাঁয় পৌঁছলাম। মনের ভোজ তো হলোই, স্থূল কাটলেট-চপ-চা ইত্যাদিও চলল।

তারপর থেকে বিনয়ের জীবনের সুতোর সঙ্গে আমার সুতোর কখনো গিঁট বেঁধেছে, কখনো গেছে ছিঁড়ে, কখনো তাঁতের মাকুর মতো ঘটনার এপাশ-ওপাশ আমাদের একেবারে একসঙ্গে বুনে দিয়েছে, কখনো সমুদ্রের ঝড়ে পালের মতো ফ্যাঁশ করে দিয়েছে ছিঁড়ে। এটা খুব স্বাভাবিক যে কখনো-কখনো বিনয় আমাকে তাঁর শত্রু মনে করতেন, বিশেষত যখন তাঁকে জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতুম। প্যারালইয়া যখন তাঁকে অধিকার করত, তিনি আমাকে তাঁর কবিতা ও গণিত চুরি করে বিদেশে পাচারের অভিযোগও করেছিলেন। যখন আমাদের ব্রড স্ট্রিটের বাড়িতে তিনি থাকতেন, আমার সর্বংসহা দুই আশ্রয়কে—মা ঊষা এবং স্ত্রী মীনাক্ষীকে—তিনি এমন উৎপাত করেছেন যে তাঁরা বিনয়ের প্রতিও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তবু, তাঁরা ক্ষমা শুধু করেননি, সেবাও করেছেন। কে না কত করছেন! অমিয় দেব তাঁর ছাদের ফ্ল্যাটে দিয়েছেন মাসেব পর মাস আশ্রয়। তিনি ও সুবীর রায়চৌধুরী তাঁর ভর্তি ও দেখাশোনা করছেন সরকারপুল হাসপাতালে। লুম্বিনীতে তাঁর চিকিৎসায় সাহায্য করেছেন সন্তুতুল্য ডঃ মৃণাল বড়ুয়া, যাঁর নিজের কাহিনী কোনো বোধিসত্ত্ব জাতকের হতে পারত। গোপনে কখনো-কখনো বিনয়ের ব্যয়ভার বহনে অর্থসাহায্য করেছেন সমর সেন। এইসব লিখছি কারণ যদিও কবিতার কথা নয় এটা জীবনের বৈচিত্র্য ও ঘনত্বের প্রমাণ। বিনয়ের নিজের ভাইয়েরা যেমন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, ভালোবাসা দিয়েছে ঠাকুর নগরের গাঁয়ের মানুষ। আমাদের সমাজ বড় এলোমলো, এমন কোনো সংগঠন কি প্রতিষ্ঠান নেই যে একজন প্রতিভাবান অসহায়ের ভার নেবে। ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত চেষ্টায় কয়েকটি সঙ্কট কাটানো গিয়েছিল বটে। কিন্তু যদি যত্ন ও সাহচর্য ও সৌন্দর্য দিয়ে তাঁর সারাটা সৃজনশীল জীবন ঘিরে রাখা যেত, তবে শুধু বাংলা ভাষাই নয়, মানব সভ্যতাই উপকৃত হতো। কারণ বিনয় মজুমদার অনন্য। আমরা অন্যেরা বাস করি সমতলে। আমাদের জন্য ইউক্লিড বিনয়ের জ্যামিতি আলাদা। তা পঞ্চ-মাত্রিক। তাঁর গণিতের কিছু বোঝার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু যেমন রামানুজনের বেলায় এখন হচ্ছে, কে জানে, ২১ শতকের কোনো বিচক্ষণ কম্পিউটার বিনয় মজুমদারের সলিউশন ও সিকোয়েন্স-পরম্পরায় শুদ্ধতা অক্লেশে করে দেবে না প্রমাণ? আমি কেবল তাঁর কবিতার কিছু-কিছু বুঝেছি। আমার বিচারে তাঁর স্থান কোথায় তা বোঝাবার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। আমেরিকায় প্রবাসকালে এশিয়া সোসাইটির তৎকালীন প্রকাশন-প্রধান শ্রীমতী বনি ক্রাউন আমার কবিতার একটি ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব করেন। আমি হেসে ফেলেছিলুম। বলেছিলাম, যে কবিতা লেখার জন্য আমার জন্ম, যা জগৎকে দেখানোর একটুও ইচ্ছে আমার হতে পারে, তার প্রথম পঙক্তিও এখনো আমি লিখিনি। কিন্তু যাঁর কবিতার সঙ্গে ইংরেজীর মধ্য দিয়ে মানবজাতির পরিচয় ঘটানো আমার স্বপ্ন তাঁর নাম বিনয় মজুমদার। এশিয়া সোসাইটির বৃত্তি পেয়ে আমি বিনয়ের ৪০টি

কবিতার অনুবাদ করেছিলাম, যার কিছু-কিছু ট্রাইকোয়ার্টার্লি, হাডসন রিভিউ ইত্যাদি বিখ্যাত কাগজে বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু সাঙরার চরণকটকি নৌকো কিংবা মরিচঝাঁপির মতোই, 'কাম ব্যাক, ও হুইল' বইটিও ছিলো অভিশপ্ত। মাঝদরিয়ায় নৌকোডুবির জন্য কুখ্যাত জ্যোতির্ময় দত্তের ট্র্যাক রেকর্ড ছিলো প্রকাশক সংস্থাটির অজানা; তাই সোৎসাহে পাণ্ডুলিপিটি যে অভাগা মার্কিন পাবলিশার মনোনয়ন করেন, সেই সংস্থাই উঠে যায়, এবং শ্রীমতী ক্রাউন কিছুতেই আর ম্যানাস্ক্রিপ্ট উদ্ধার করতে পারেননি। কিন্তু ঐ অক্ষম ভাষান্তরেও বিনয়ের কবিত্ব কতটা প্রভাব ফেলেছিল তার একটা হৃদয়বিদারক প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম। আমার অভিজ্ঞতায় যে ভারতীয় যুবক ছিলো ইংরেজী ভাষার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় লেখক, যার গায়ের রঙ ছিলো খরমুজের ভেতরটার মতো আর যার অন্তর ছিলো স্বপ্নময় ও বিশুদ্ধ, কিছুটা শেলি আর কিছুটা বিবেকানন্দ, যাঁর জন্ম টোকিয়োতে এবং শিক্ষা কেমব্রিজে, সেই ধীরেন ভগৎ বিনয়ের অনুবাদ পড়ে বিলেত থেকে কলকাতায় এসে খুঁজে-খুঁজে বার করেছিলেন আমাকে, এবং পুজোয় বাঙালী সাজে প্রতিমা দর্শনের অভিলাষে কিনেছিলেন পাঞ্জাবি এবং ধুতিও। ঋষি কি দেববালকদের রূপে ও পবিত্রতায় লজ্জা দেওয়া ধীরেন দিল্লিতে ইংলণ্ডের বিখ্যাত এক কাগজের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল, এবং জীবনরসে উপচে আমাদের পুরো পরিবারকে নিমন্ত্রণ করেছিল বড়দিনের ছুটিতে রাজধানীতে। নতুন গাড়ি কিনেছে। বাড়িটা লোদি গার্ডেনের পাশেই। দিল্লির আবহাওয়া তখন নাকি ইতালীর বসন্ত। কয়েকদিন পরেই দেখলাম, ধুলোর পৃথিবীতে এক ইস্পাতের বর্গাবোঝাই লরির সঙ্গে তার গাড়ির ধাক্কায়, এই ধুলোর পৃথিবীতে তার মেয়াদ কাটিয়ে ধীরেন সুরলোকে ফিরে গেছে। ধীরেনের বাবা-মা এখন কোথায় জানি না। কিন্তু সেই থেকে তার জন্য আমার ব্যথা ও শূন্যতাবোধ জানাবার বাহন খুঁজছিলাম। ব্যবধান ও ইন্দ্রিয়াতীত সম্পর্কস্থাপনের কবি বিনয় মজুমদারকে উদ্দীষ্ট এই শব্দস্তবকে ধীরেনের জন্য একটি ঘাসফুল গুঁজে দিলাম।

২. কবিতা: প্রথম পর্ব

ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে বিচ্ছেদ এটা তো সব আধুনিক শিল্পেরই—মর্মকথা। তাহলে বিনয় অন্য কবিদের থেকে ভিন্ন কিসে? ভিন্ন এই বিচ্ছেদ বোধের তীব্রতায়। ভিন্ন তাঁর চিত্রকল্পে। 'ফিরে এসো, চাকা', বাহ্যত একজন ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বিচ্ছদের কবিতা। 'চাকা' হচ্ছে 'চক্রবর্তী'-র অপভ্রংশ। এই কবিতামালা গায়ত্রী চক্রবর্তী নামের এক রক্তমাংসের সত্তার উদ্দেশ্যে রচিত বলে কবি একদা দাবি করতেন। কিন্তু পরে অন্য নামও উৎসর্গে ব্যবহার করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত, বিচ্ছেদ প্রকৃতপক্ষে কার সঙ্গে তা গ্রন্থের পরিবর্তিত নামেই স্বচ্ছ : 'ঈশ্বরী'র জন্য।

জর্মান কবি, নাট্যকার ও ভাবুক শিলার তাঁর এক বিখ্যাত রচনায় প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের পৃথক লক্ষণরূপে ব্যক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে এই ছেদ, এই ব্যবধান এই বিরুদ্ধতাকেই নির্দেশ করেছিলেন। সভ্যতার ছেলেবেলায়—হোমার কি বাল্মীকির

কালে—মানুষ প্রকৃতির কোলে শুয়ে, তাঁর স্তনবৃন্তে মুখ রেখে— অচ্ছেদ পান করেছে সুধা। সেই অপাপবিদ্ধ যুগের শিল্পকে শিলার আখ্যা দিয়াছিলেন 'নাউভ'—'সরল'। পরবর্তী যুগের শিল্প 'সেন্টিমেন্টাল' অনুভূতিময় ও অভিমানাহত। 'ব্যক্তি' হওয়া মানেই জননীর সঙ্গে নাড়ীচ্ছেদ। আধুনিক মানুষ প্রকৃতির ক্রোড় থেকে বহিষ্কৃত। আগে প্রত্যেক ঝর্না, পর্বত, নক্ষত্র মানুষের সঙ্গে কথা বলত। সহবাস করত। এখন তারা দূর, হৃদয়হীন, বিজাতীয়।

> জরায়ু ত্যাগের পর বিস্তীর্ণ আলোকে এসে শিশু
> সৃষ্টির সদর্থ-বোঝে, নিজস্ব পিপাসা, ক্ষুধা পায়।
> অন্ধকার সীমা ছেড়ে চেয়ে দ্যাখে, আরও পরিসীমা
> আকাশের নীলে, চাঁদে, নক্ষত্রের আহ্বানে নিহিত।

এই বিচ্ছেদবোধ ক্রমে তীব্র হতে হতে কখনো উথলে উঠেছে বিলাপে, কখনো পরিণত হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বে কি ঘৃণায়। শিবনারায়ণ রায় এই আধুনিক বিচ্ছেদানুভূতিব নাম দিয়েছেন 'পারক্য'। ইংরেজীতে যাকে বলি 'অ্যালিয়েনেশন', 'আমি' হচ্ছি একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। বাকি সব কিছু হচ্ছে 'অপর'। এই অপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যই আমাদের সকল কান্না। কিন্তু ঐ 'অপর' শেষ পর্যন্ত অপ্রবেশ্য, অজ্ঞেয়, মানবের সব আকুতিমিনতিতে প্রতিক্রিয়াহীন। বের্টল্ট ব্রেখট-এর কবিতায় তাই বারংবার প্রার্থনা কি বিলাপের প্রতি বিদ্রূপ। সৌরলোক, ছায়াপথ, দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ডের পর দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ড পার হয়ে যাক ভয়েজারের চেয়ে কোটিগুণ শক্তিমান মহাকাশযান, কোথাও পাবে না আমাদের এত ব্যাকুল প্রার্থনার উদ্দীষ্ট পরম স্নেহময় ঈশ্বরেব কিংবা বিনয়ের 'ঈশ্বরী'-র, দর্শন। এই 'ঈশ্বরী' কখনো প্রেমিকা, কখনো মাতা, যে তাঁকে 'অবৈধ সন্তানের মত' ফেলে গেছে পথে।

> কী বিস্মিত বেদনায় একা-একা কেঁদে ফেরে শিশু।
> অজীর্ণ, তোমাকে নিযে আর কতো গান গাওয়া হবে?
> এতোকাল চলে গেলো, তবু মাঝে-মাঝে বাতায়ন
> খুলে দেখি, মহাশূন্যে গোয়েন্দার মতো জোনাকিরা
> জ্বলে নেভে, জ্বলে নেভে, তৃষ্ণা নিয়ে এরূপ খেলায়
> কতোকাল চলে গেলো: মরণের মতো ক্লান্তি আসে।

আধুনিক কবিতা এই অজীর্ণের, প্লীহার গান। বিনয় 'মরণের মতো ক্লান্তি'-কে জয়ের চেষ্টায় শেষের দিকের কবিতায় যা করেছেন তা, আমার উপলব্ধিতে, পয়ারবদ্ধ স্বমেহন, নয়তো সৃষ্টির সঙ্গে একত্বের হার্দিক প্রয়োজনের কাছে যুক্তির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। কিন্তু বিনয়ের প্রথম পর্বের কবিতায় সংশয় ও বিশ্বাসের, নাস্তি ও অস্তির মধ্যে তুলার কাঁটা এ-মেরু ও-মেরু করে। 'তুমি' কি বাস্তব? হয়তো তোমাকে না-দেখতে পাওয়াই তোমার সান্নিধ্যের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ? কিংবা তোমাকে পুরোটা

পাচ্ছি না, তা নৈরাজ্য কি বেনিয়ম কিছু নয় তা বিশ্বনিয়মেরই অধীন কোনো মহাজাগতিক ঘটনা ? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মন ভালো নেই' কবিতায় শিবনারায়ণ-চিহ্নিত ঐ বইয়ের একটি পারক্যবোধ যথেষ্ট আছে, কিন্তু কবি তা হাল্কা জলরঙে এঁকেছেন, বিনয়ের যেখানে ভাষা জ্যামিতিক। সুনীল "ক্ষণিকের কৌতুক" পানে তুষ্ট ; বিনয়ের "মরণের মতো তুচ্ছ"। সুনীলের 'বাসনা আমার' কবিতার শেষ আট লাইন।

আমি কেউ নই সম্মিলিত এ সুরে
যারা কাছে ছিল তারা আজ বহু দূরে
টেলিপ্রিন্টারে ছিন্নভিন্ন পৃথিবী
সকলেই বলে, কী দিবি, কী দিবি, কী দিবি ?
বাসনা আমার, হে মর্ত্য লোভী বাসনা,
তুমি কি এখনো নিরালায় ভালোবসো না
পান করে যেতে ক্ষণিকের কৌতুক?
সাথী কেউ নেই ? আয়নায় কার সুখ ?

সুনীলের ছন্দের মন্দিরায় আমরা মোহিত। কিন্তু বিনয়ের চিত্রকল্প উপমা নয়, তা যেন বিজ্ঞান। নিচের কবিতায় একটিও লাইন নেই যাতে শিল্পের সেইসব কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে যার মাদকপ্রভাবে আমরা সতর্ক হয়ে যাই, অলীক জেনেও কবির অভিপ্রেত স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিই। সমালোচকেরা যাকে বলেন 'মোমেন্টারি সাসপেনশন অফ ডিজবিলিফ', তার যেন কোনোই প্রয়োজন নেই এই কণাবিজ্ঞান ও গণিত-সাধকের একটা প্রেমের কবিতা? না তীব্র ধর্মবিশ্বাসের? এটা কি ধাপ-ধাপ যুক্তির পাথর বসানো অটল পিরামিড ? নাকি কয়েকটি বরফের কিউব --যা একটু চিন্তার তাপেই গলে যাবে। এখানে উপস্থিতি লুকোচুরি খেলছে অনুপস্থিতির সঙ্গে। তুমি নেই ? তুমি কি তেমনই নেই "অগনন কুসুমের দেশে" যেমন নেই নীল গোলাপ ? কিন্তু এই না-থাকাটা হয়তো তোমার থাকারই প্রমাণ ? এমনকি চন্দ্র-সূর্যও তো কখনো-কখনো মনে হয় নেই। পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময়। যা দিয়ে আমরা এত রং দেখি, সেই নিজের চোখের মণির তো রং আমরা দেখি না। তোমার অনুপস্থিতিই তোমার নৈকট্যের প্রমাণ। মাত্র ১০টি লাইন, কিন্তু বৃত্তসংহার কাব্যের চেয়ে দীর্ঘ এর রেশ, এমনকি রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কিংবা 'যেতে নাহি দিব' কবিতার চেয়েও বিস্তার এর বেশি।

আর যদি নাই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী;
বাষ্পের সহিত বাতাসের মতো নাই মেশো,
সেও এক অভিজ্ঞতা; অগনন কুসুমের দেশে
নীল বা নীলাবর্ণ গোলাপের অভাবের মতো
তোমার অভাব বুঝি; কে জানে হয়তো অবশেষে
বিগলিত হতে পারো; আশ্চর্য দর্শন বহু আছে—
নিজের চুলের মৃদু ঘ্রাণের মতন তোমাকেও

হয়তো পাইনা আমি; পূর্ণিমাব তিথিতেও দেখি
অস্ফুট লজ্জায় ম্লান ক্ষীণ চন্দ্রকলা উঠে থাকে।
গ্রহণ হবার ফলে, এরূপ দর্শন বহু আছে।

আগেই বলেছি, 'ফিরে এসো, চাকা' একটি শান্ত সবুজ পাহাড়ের চূড়া উড়ে যাওয়ার মতো আকস্মিক বলে প্রথমে মনে হয়। এবং কবি নিজেই জানিয়েছেন যে এই ভূগর্ভের অগ্নি-উৎক্ষেপণের কারণ 'প্রত্যাখ্যাত প্রেম'।

প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন।
অগ্নি উদ্গমন ক'রে এ-গহ্বর ধীরে-ধীরে তার
চারিদিকে বর্তমান পর্বতের প্রাচীর তুলেছে।
এতো উচ্চে সমাসীন আজ তার আপন শঠতা.
যাতে সমতলবর্তী প্রজাপতি, পাখিদের রঙ
তার কাছে নিরর্থক; এমন সমস্যাকীর্ণ আমি।
দূবে যাও মেঘমালা, তোমাদের দৌত্যে, আলিঙ্গনে
আমি আর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের ক্রোড়ে তো যাবো না।
আমি যাবো দেশান্তরে যেখানে ফুলের মুক্তি আছে।
বৃষ্টি, ঢেউ, ত্যাগ ক'রে রসে পুষ্ট শিল্প পেতে পারি
বর্তমানে, চাবিপাশে পর্বতের প্রাচীর আসীন।
আমি আর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের ক্রোড়ে তো যাবো না।

প্রেমে তো অনেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে; কিন্তু "অসহ ধিক্কারে" অন্য কেউ তো এরকম ঝলকে-ঝলকে কবিতা উৎক্ষেপণ করেন না? রবীন্দ্রনাথের ধাপে-ধাপে বিবর্তন আমরা দেখতে পাই। 'যে আঁধার আলোর অধিক'-এ পৌঁছতে বুদ্ধদেব বসুকে দ্রৌপদীর শাড়ি-র কত না ভাঁজ খুলতে হয়েছে, ভাঙতে হয়েছে কবিতার কত না ঘোরানো সিঁড়ির ধাপ! এমনকি জীবনানন্দেরও গেছে নজরুল-মোহিতলাল পর্ব। কিন্তু বিনয় মজুমদারের যেন কোনো প্রস্তুতি নেই! 'ফিরে এসো, চাকা' যেন মহাকাশ থেকে পড়া—বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত—একটি উল্কাখণ্ড। প্রথম কবিতার প্রথম লাইনেই বিনয় তাঁর নিজস্ব ভাষা, সুর, ছবির মালিক :

একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেলো—এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে
বেদনার গাঢ় রসে আপক্কে রক্তিম হ'লো ফল।—

এটার তারিখ ৮ই মার্চ ১৯৬০। পরেরটি ২৬শে আগস্ট। দ্বিতীয় কবিতার শেষ ৭ লাইন :

সুস্থ মৃত্তিকার চেয়ে সমুদ্রেরা কতো বেশি বিপদসঙ্কুল
তারো বেশি বিপদের নীলিমায় প্রক্ষালিত বিভিন্ন আকাশ,

এসত্য জেনেও তবুও আমরা তো সাগরে আকাশে
সঞ্চারিত হতে চাই, চিরকাল হতে অভিলাষী,
সকল প্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া আমাদের ভালো লাগে বলে।
তবুও কেন যে আজো, হায় হাসি, হায় দেবদারু,
মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।

তৃতীয়টি লেখা হল ২৬ দিন পর— ২১শে সেপ্টেম্বর। পরেরটা ১১ই অক্টোবর। পঞ্চমটি ১২ই অক্টোবর। ১৪ই অক্টোবর। ১৫ই অক্টোবর। সময়ের ব্যবধান কমে আসছে। তাল-লয়-ক্রম দ্রুত হচ্ছে। তাবপর, অকস্মাৎ বিরতি। নয় মাসের। 'ফিরে এসো, চাকা'-র অষ্টম কবিতার তারিখ ১৫ই জুন, ১৯৫১। এই পর্বে কোনো-কোনো দিন—যেমন ২৬ ও ২৭শে জুন—দু-দুটি কবিতা বিনয়ের ফার্নেস থেকে বেরিয়ে এসেছে, একেবারে নিখাদ, বুদবুদ কি ভস্ম নেই, যেন শিল্প নয়, নগ্ন প্রকৃতি। প্রত্যেকটি কবিতা যেন 'রচিত' নয়, তা সমুদ্রের তল থেকে ঢেউয়ের আবর্তে তটে ফেলে যাওয়া। কিন্তু, যদিও "সকল প্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া" মানুষের স্বভাব, সকলের জ্বরতপ্ত মাথা এক প্রক্রিয়ায় চলে না। বিনয়ের মাথার ভেতরের সফটওয়্যার কী ছিল তখন ? সফটওয়্যারটা বাংলা কবিতা, যার মেমারিতে স্পষ্টতই জীবনানন্দের পুরোটা ঠাসা। কিন্তু সার্কিটরি ? সেটা বিজ্ঞানের। প্রথম দিকের কবিতায়, দুটি স্তর আলাদা কবা যায়। যেমন নিচের আট লাইনে প্রথম তিন এবং শেষ পঙ্‌ক্তির লেখক বি ই কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিঙে ফার্স্ট ক্লাস; ৪, ৫ ও ৬ লাইন বিলকুল জীবনানন্দ; আর সপ্তম লাইন নির্ভেজাল বিনয় মজুমদার।

তাঁবুর ভিতরে শুয়ে অন্ধকার আকাশেব বিস্তার দেখেছি।
জেনেছি নিকটবর্তী এবং উজ্জ্বলতম তারাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে
সব গ্রহ, তারা নয়, তাপহীন আলোহীন গ্রহ।
আমিও হতাশা বোধে, অবক্ষয়ে, ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে
মাটিতে শুয়েছি একা—কীটদষ্ট নষ্ট খোসা, শাঁস।
হে ধিক্কার, আত্মঘৃণা, দ্যাখো কী মলিনবর্ণ ফল।
কিছুকাল আগে প্রাণে, ধাতুখণ্ডে সুনির্মল জ্যোৎস্না পড়েছিল।
আলেকসম্পাতহেতু বিদ্যুৎসঞ্চার হয়, বিশেষ ধাতুতে হয়ে থাকে।

সব শিল্পেই রেওয়াজ লাগে। পিয়ানোতে আঙুল খুলতে কারো লাগে বছর, কারো বা মাস। বিনয়ের ক্ষেত্রে লেগেছিল নয় মাস। ২৭শে জুন ১৯৬১ বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। সেদিন যে-দুটি কবিতা বিনয় লিখেছিলেন তার একটি থেকে :

অমল প্রত্যূষে
ঘুম ভেঙে দেখা যায় আমাদের মুখের ভিতরে
স্বাদ ছিলো, তৃপ্তি ছিলো যেসব আহার্য তারা পচে
ইতিহাস সৃষ্টি করে; সুখ ক্রমে ব্যথা হয়ে ওঠে।

পাঁচদিন পরে; ১লা জুলাই; তিনি আরোহণ করলেন বাংলা কবিতার এক শিখরে।

সভয়ে ভেবেছিলাম সম্মিলিত চায়ের ভাবনা,
বায়ুসেবনের কথা, চিরন্তন শিখরের বায়ু।
দৃষ্টিবিভ্রমের মতো কাল্পনিক ব'লে মনে হয়
তোমাকে অস্তিত্বহীনা, অথবা হয়ত লুপ্ত, মৃত।
অথবা করেছো ত্যাগ, অবৈধ পুত্রের মতো, পথে।
জীবনের কথা ভাবি, ক্ষত সেরে গেলে পরে ত্বকে
পুনরায় কেশোদগম হবে না: বিমর্ষ ভাবনার
রাত্রির মাছির মতো শান্ত হয়ে রয়েছে বেদনা—
হাসপাতালের থেকে ফেরার সময়কার মনে।
মাঝে-মাঝে অগোচরে বালকের ঘুমেব ভিতরে
প্রস্রাব কবার মতো অস্থানে বেদনা ঝরে যাবে।

৩. কবিতা: পরবর্তী পর্ব

ব্যাখ্যা করে এরকম বহু-স্তর, বহু-মাত্রিক কবিতায় অনুপ্রবেশ করার রোমাঞ্চ থেকে পাঠককে বঞ্চিত করব না; তবে এটা উল্লেখ না-করে পারছি না যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর যেমন পুরুষ, তাঁর আখ্যা স্বামী, কি রাজার দুলাল, কি জীবনদেবতা, বিনয়ের ক্ষেত্রে সেই স্থান নারীর—প্রেমিকা, জননী, ঈশ্বরী। রবীন্দ্রনাথের মতো, তাঁরও প্রেম ও পূজা মেশামেশি। প্রভেদ, রবীন্দ্রনাথের মিলনেচ্ছা যখন রথের চাকার ধুলো ও ফুলের গন্ধ মেশা, বিনয়ের পরবর্তী রচনা প্রায় তন্ত্রসাধকের মতো, তা কামুকের, এবং কোনো-কোনো কবিতা স্রেফ পর্নোগ্রাফি বলে মনে হতে পারে। যেমন 'চাঁদ' সিরিজ। ব্লো-বাই-ব্লো অ্যাকাউন্ট সঙ্গমে এগুলি কবিতা ? না পর্নোগ্রাফি ? বিনয়ের পুরো মানসিক মানচিত্রের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, এটা নির্ভেজাল 'পর্ন' বলে ভ্রম হতে পারে। সন্দহ জাগতে পারে কবিতার স্থায়ী রোমাঞ্চ নয়, এটা কেবল করে সাময়িক যৌন উত্তেজনার সঞ্চার।

চাঁদের গুহার দিকে

চাঁদের গুহার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকি, মেঝের উপরে
দাঁড়িয়ে রয়েছে চাঁদ, প্রকাশ্য দিনের বেলা, স্পষ্ট দেখা যায়
চাঁদের গুহার দিকে চেয়ে থাকি, ঘাসগুলি ছোটো ক'রে ছাঁটা।
ঘাসের ভিতরে দিয়ে দেখা যায় গুহার উপরকার ভাঁজ।
গুহার লুকোনো মুখ থেকে শুরু হয়ে সেই ভাঁজটি এসেছে
বাহিরে পেটের দিকে। চাঁদ হেঁটে এসে যেই বিছানার উপরে দাঁড়ালো
অমনি চাঁদকে বল্ল, 'তেল লাগাবেনা আজ' শুনে চাঁদ বলে,
'মাখব নিশ্চই, তবে একটু অপেক্ষা করে' বলে সে অয়েল ক্লথ
পেতে দিল। বিছানায়, বালিশের কিছু নিচে, তারপর হেঁটে চলে গেলো

নিকটে তাকের দিকে, একটি বোতল থেকে বাম হাতে তেল নিয়ে এল
এসে তেল মাখা হাতে আমার ভুট্টাটি চেপে ধরে।
যখন ধরল তার আগেই ভুট্টাটি খাড়া হয়েগিয়েছিল।
চাঁদ আমি দুজনেই মেঝেতে দাঁড়ানো মুখোমুখি
এক হাতে ঘসে ঘসে ভুট্টার উপরে চাঁদ তেল মেখেদিলো।

আমার ভুট্টায় তেল

আমার ভুট্টায় তেল মাখতে মাখতে চাঁদ বললো, 'তোমার
ভুট্টাটি
ভীষণ মোটা' আমি তার জবাব না দিয়ে
অন্য কথা বললাম— 'ভুট্টার মাথায় একটি তেল মাখ' তবে
চাঁদ কিন্তু ভুট্টাটিকে ফুটিয়েও ভুট্টার মাথায়
তেল মাখলে না শুধু চারপাশে গায়ে মাখে, তেল মাখা হলে
চাঁদ মেঝে থেকে হেঁটে বিছানায় এসে শোয় বিছানা মেঝেই পাতা থাকে।
বালিশে মাথাটি রেখে পাদুটিকে তুলে ধরে শুয়ে পড়ে, আমি
হাঁটু গাড়ি, দু হাঁটুর নিচে দিই খুলে রাখা গরম প্যান্ট ও জামাটিকে।
তারপরে গুহা দেখি গুহাটি বন্ধই আছে, দু পা ফাঁক করলেও গুহার
সম্পূর্ণ বন্ধই থাকে, চাঁদ শোয়া অবস্থায় হাত দিয়ে ভুট্টাটিকে ধরতে গেলেই
আমি তাকে বললাম 'আমি ভুট্টাটি নিজেই ঢোকাতে পারি কিনা
দেখা যাক' বলতেই ভুট্টাটিকে চাঁদ আর ধরলো না, ভুট্টার মাথাটি
গুহার বোজানো মুখে চেপে ধরে ঠেলা দিই সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ি
ভুট্টাটি সহজভাবে ঢুকে গেল সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা শুরু করি।

এটি স্পষ্টতই কোনো 'বাস্তব' অভিজ্ঞতার বর্ণনা—যদিও নারীটিকে বিনয় 'চাঁদ' রূপে অভিহিত করেছেন('ফিরে এসো, চাকা'য় জ্যোৎস্না হচ্ছে বাস্তব প্রতীক)। অয়েল ক্লথ, তাক, বাঁ হাতে তেল—এগুলি হচ্ছে বাস্তবে অনুপুঙ্খ, চিত্রকল্প নয়। অ্যালেন গিন্সবার্গের 'পাগল' সঙ্গী, পিটার অর্লোভস্কিকেও, এইভাবে দেখেছি নিউইয়র্কে ঐ অঞ্চলের নারীদের দ্বারা ষাঁড় হিসেবে ব্যবহৃত হতে। 'পাগল'দের সঙ্গে সঙ্গমে সামাজিক দায়িত্ব নেই—একটা বিপদ ছাড়া। বিনয়ের মস্তিষ্কের হার্ডওয়্যার পয়ারে বাঁধা, যে-কোনো সফটওয়্যার, যে-কোনো অভিজ্ঞতাই ৮/৬৪ কিংবা ততোধিক মাত্রায় প্রসেস করে তা বার করে দেয়। কিন্তু এগুলো কি কবিতা? জানি না। কিন্তু এটাও জানা দরকার, প্রকাশের যোগ্য শুধু নয়, বিশেষভাবে পঠিতব্য ও আলোচিতব্য। যে-কবি ঐ চিরন্তন শিখরের বায়ু সেবন করেছেন, কেন কোনো এক বা একাধিক গ্রাম্য নারীর ধর্মের ষাঁড়ের ভূমিকা পালন করবে?

কেউ কি নয়? সৃষ্টির রহস্যের সেতুর চেয়ে শক্তিশালী কোনো প্রবেশিকা আবিষ্কার করতে পেরেছেন? এখানে 'ধর্মের' শব্দটি সচেতনভাব চয়িত। শিমুলপুরের আগাছা ও জঙ্গলে ঘেরা নির্জন বাড়িতে কখনো পুকুরের ধাপে নিশ্চুপ বকের মতো

একপায়ে ধ্যানস্থ, কখনো কাঠঠোকরার মতো মাথা ঠুকছেন, কখনো বিড়বিড় করছেন ফুলের দিকে তাকিয়ে যে সমাজ-পরিত্যক্ত মানুষ, তিনি ঈশ্বরীর সঙ্গে এইভাবেই যোগ খুঁজছেন একবার "ধাতুখণ্ডে যে সুনির্মল জ্যোৎস্না পড়েছিল" তাই আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে 'চাঁদ'।

পৃথিবী ঘাস, মাটি, মানুষ পশু ও পাখী—সবার জীবনী লেখা হলে,
আমার একার আর আলাদা জীবনী লেখা না হলেও চলে
আমার ব্যথা, প্রস্তাব, প্রফস তবু সবই লিপিবদ্ধ থেকে যেতো।
তার মানে মানুষের, বস্তুদের, প্রাণীদের জীবনী প্রকৃতপক্ষে পৃথক পৃথক
অসংখ্য জীবন নয়, সব একত্রিত হয়ে একটি জীবন মোটে...

এটা কি পাগলের ভ্রান্তি? নাকি পাস্কালের হাহাকারের উত্তর? হয়তো সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেই "একটি জীবন মোটে"? এই সমুদ্র-মেঘ ঘেরা, উদ্ভিদ-মীন-কীট-স্তন্যপায়ী প্রাণীময় পৃথিবী যে সামগ্রিক সত্তার শরীরে একটি কোষাণুকোষ মাত্র? যেমন রক্তের কোটি কোটি শ্বেতকণিকার কাছে আমাদের শরীর একটি বিশাল জগৎ, বহির্বিশ্ব থেকে হানাদার এলে যাদের প্রতিহত করতে শ্বেতকণিকা বাহিনী সশস্ত্র অগ্রসর হয়। আমার শ্বেতকণিকাগুলি কি জানে আমি কে? আমার মস্তিষ্কে যে রাসায়নিক কণাগুলির নিক্ষেপ সেই বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করে থাকে আমি বলি 'চিন্তা', 'বার্তা' 'ভালোবাসা', 'ঈশ্বরানুভূতি', 'কাম'—সেই কণাগুলিব কি আমার বিষয়ে আছে কোনো সম্যক বোধ কি ধারণা?

বিনযের প্রতিপাদ্য সারবান; একেবারে হলের কণাবিজ্ঞান থেকে শুরু করে উপনিষদে আছে তার সমর্থন। আমাব আক্ষেপ শুধু যে বিনয়ের কবিতায় নেই আর সেই বিদ্যুৎগর্ভ উপমা-মেঘের চমকানি। তা নিরস বর্ণনা কি ঘোষণামাত্র। নেই সেই কবিত্বের ডায়ানোমো—উৎপাদিত বিদ্যুৎ যার দ্বারা ঠাণ্ডা অ্যালুমিনিয়ামের কেবল্ পরিণত হয় হাজার ভোল্টের লাইভ ওয়্যারে। বিনয়ের কবিতার পঙক্তি এখন মৃত লাইন— যাকে কোনো মতে টানটান ধরে রেখেছে পয়ারের পাইলন।

স্নবারি থেকে স্লোগানে

সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে কলকাতার গত সংখ্যায় কয়েকটি মত প্রকাশিত হয়েছে যা আমি কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণসাপেক্ষ মনে করি। শুধু খুঁটিয়ে দেখার যোগ্য নয়, হয়তো প্রতিবাদের যোগ্যও বটে। এ পত্রিকায় যা-কিছু প্রকাশিত হয় তা সম্পাদক হিসেবে আমি আলোচনার যোগ্য মনে করি বলেই প্রকাশ করি। কিন্তু যা আমার মতের বিপরীত তা কি আমার প্রকাশ করা উচিত ? এবং প্রকাশ করলে, তার প্রতিবাদ করা কি আমার পক্ষে শোভন ? উভয় প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে স্পষ্ট। যে-কোনো মত প্রকাশের অধিকার যেমন লেখকের আছে, তার প্রতিবাদ করার অধিকারও পাঠকমাত্রেরই আছে। যদি কোনো প্রবন্ধ সুলিখিত হয়, যদি প্রবন্ধকার তাঁর মত যুক্তিসহকারে, কিংবা জোরালোভাবে প্রকাশ করতে পারেন, তবে তা নিশ্চয় ছাপানো উচিত। এবং আমাকে মানতেই হচ্ছে যে, যে-রচনার প্রতিবাদ করতে আমি উদ্যত হয়েছি—শ্রীঅশোক মিত্র লিখিত 'কবিতা থেকে মিছিলে' —তা ঐ জাতীয় রচনার পক্ষে বেশ সুলিখিত, এবং মিত্রমহাশয় তাঁর মত যুক্তিসহকারে উপস্থিত না-করলেও, খুব জোর গলায় যতিচিহ্নবিরল চিৎকৃত প্রাদেশিক বাংলাতেই করেছেন।

কিন্তু সম্পাদক হিসেবে কোনো রচনা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করা এক কথা, আর সে-বিষয়ে মৌন থেকে ঐ মতে সম্মতিদান আরেক কথা। মিত্রমহাশয়ের রচনার একটি শব্দও পরিবর্তন করা হয়নি; এবার তাঁর বিরুদ্ধমতও যদি প্রকাশিত হয় তবে আপত্তি করার কী থাকতে পারে ? সাধারণত সম্পাদকের সঙ্গে এরূপ তর্ক অসম; সম্পাদক প্রতিপক্ষের রচনার অঙ্গচ্ছেদ করে, বিকৃত করে, উপস্থিত করতে পারেন কিন্তু এক্ষেত্রে সমানে-সমানে আলোচনায় আশা করি মিত্রমহাশয় কষ্ট বোধ করবেন না।

আশা করি। কিন্তু নিশ্চিত নই। কারণ মিত্রমহাশয়ের রুষ্ট হওয়ার ক্ষমতা আসামান্য। তার অতি সহজেই "ন্যক্কারে...শ্লেষ্মা ভ'রে ওঠে" (পৃ. ৩৪)।

পাছে কোনো অসাবধান পাঠক তাঁর উষ্মাকে ক্রোধের অভিনয় বলে ভুল করেন, কিংবা মনে করেন যে তাঁর ক্রোধের যথেষ্ট হেতু আছে, তিনি সতর্ক করে দেন যে তাঁর রাগ নকল নয়, তিনি ভয়ানক বদরাগী মানুষ: "আমি গাল পাড়বার জন্যই গাল পাড়ছি" (পৃ. ৩৪)। কিন্তু এই স্বীকারোক্তি বিনাই তাঁর প্রবন্ধের কয়েক পঙ্‌ক্তিপাঠেই বোঝা যায় যে মিত্রমহাশয় অতিশয় তেজস্বী পুরুষ। তিনি ঘোর দুঃসাহসের সঙ্গে বাংলাদেশের দুর্দশার প্রধান কারণের বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এরকম নির্ভীকতা, এরকম স্পষ্টবাদিতা এই বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে—যেখানে "ভদ্রসমাজে রূঢ়ভাষণের ঐতিহ্য নেই" (পৃ. ৪৪)— অবশ্যই বিরল।

বস্তুতই, ক্রোধ অতি পবিত্র অনুভূতি। যখন ক্ষমতাবান অক্ষমকে পেষণ করে, যখন ঐশ্বর্যবান তার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মোটারগাড়িতে উদ্বাস্তুপল্লীর মধ্য দিয়ে দ্রুত চলে যান পাছে ন্যক্কারে তার শ্লেষ্মা ভরে ওঠে যখন গেজেটেড অফিসার তার চাপরাশিকে কিংবা কভেনান্টেড অফিসার তাঁর 'বাবু'কে তর্জন-গর্জন করেন, তখন যে ক্রুদ্ধ হয় না সে মানুষ নামের অযোগ্য। এই পৃথিবীতে আজ বলমদগর্বিতদের বুটের লাথি চতুর্দিকে বর্ষিত হচ্ছে। প্যারিস, শিকাগো, প্রাগ, মস্কো—সর্বত্রই প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রবল হয়ে উঠেছে। সর্বত্রই অন্যায়, কিন্তু তা খুঁজতে অত দূরদেশে যাওয়ার দরকার নেই। এই বাংলাদেশে, এই কলকাতা শহরে, প্রত্যহ, প্রতিমুহূর্তে যে-অসাম্য, নৃশংসতা, অবিচার স্বার্থপরতা, লোভ, অন্যায় ঘটে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে ক্রোধ অতি পবিত্র, অতি প্রয়োজনীয় অনুভূতি; এবং আমরা সবাই যথেষ্ট ক্রুদ্ধ নই, বাংলাদেশে ক্ষমতাবানের অত্যাচার এবং স্বার্থপর ও বুদ্ধিহীনের শাসন আজও অব্যাহত আছে।

মিত্রমহাশয় ক্রুদ্ধ, সত্য। ঠিক, তিনি এখনো ঘৃণা করতে পারেন। কিন্তু তাঁর ক্রোধ ও ঘৃণা কার প্রতি? ক্ষমতাবানের প্রতি তিনি কী রুষ্ট? সমাজের যাঁরা মাথা, বড়ো-বড়ো সব নেতা, অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ প্রত্যাগত স্যুটধারী ইংরেজীভাষী বঙ্গনন্দন যাঁরা ক্লাইভ স্ট্রিটের একেকটি ছোটলাট হয় বসে আছেন, পরিকল্পনা কমিশনের সব বিশেষজ্ঞ, কুবেরতুল্য ধনপতিগণ, অতিভোজনের ফলে যাঁদের গলকম্বল পাছে ঝুলে পড়ে ভয়ে যাঁরা গলফ খেলেন, যাঁরা প্রাসাদে থাকেন, তাঁদেব প্রতি ঘৃণায় তবে কি মিত্রমহাশয়ের শ্লেষ্মা ভরে ওঠে? না, তাঁর বিতৃষ্ণার পাত্র-পাত্রী যাদবপুরের ঘিঞ্জি উদ্বাস্তুপল্লীর বাসিন্দারা, যাঁরা ট্রামে-বাসে আপিস যায়, যাঁরা ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র। "চোখ ভিতরে ঢুকে-যাওয়া, গালদুটো গহ্বরে রূপান্তরিত, কঙ্কাবতীপ্রতিম কেশরাশি হতাশায় লেপ্টে-আসা, এমন উপহাস-উদ্রেককারী স্বাস্থ্য ব্যাধিগ্রস্ত ভিখিরিরও যৌনবোধ জাগবে না"। (পৃ. ৩৬)।

মিত্রমহাশয়ের কাছে গলকম্বল উপহাস-উদ্রেককারী নয়, ক্ষুধার্তই তাঁর টিটকিরির পাত্র। এবং ভিখিরিদের তিনি প্রায় অন্য এক জাতির জন্তু বলে বিবেচনা করেন; মিত্রমহাশয়ের মতো ভদ্দরলোক যে-সব নারীদেহ দেখে মোটেই কামার্ত বোধ করেন না, এ নিম্ন শ্রেণীর জীবগুলির কাম এতই উগ্র যে তা দেখেও এরা উত্তেজিত হয়! কিন্তু বাংলাদেশের ইস্কুল মাস্টারনি আর কেরানি মেয়েরা দারিদ্র্যবশত এমনি প্রেতিনী প্রায় হয়ে গেছেন যে ব্যাধিগ্রস্ত ভিখারিরূপ জন্তুরাও আর তাদের দেখে কামার্ত হয়ে ওঠে না।

মিত্রমহাশয়ের কল্পনারও অতীত যে "যাদবপুরের উদ্বাস্তু পল্লিতে, কাঁথির বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামে, সন্ধ্যায় ডালহৌসিতে ন-নম্বর কি চোদ্দ নম্বর বাসের জন্য প্রতীক্ষমাণ ছায়া-ছায়া ঘামের পূতিগন্ধযুক্ত ভিড়ে" (পৃ. ৩৬), আমরা যারা অপেক্ষা করি তারা দরিদ্র হতে পারি কিন্তু তারাও মানুষ, তারা কোনো নরকের ছায়া-ছায়া প্রেত নয়, এবং সেহেতু সুখ ও দুঃখ, প্রেম ও করুণা, সহমর্মিতা ও ক্রোধে তাদের চিত্তও

আন্দোলিত হয়। আমার বোধে বরং যারা দরিদ্র, যারা শোষিত, তারাই মানুষ, মিত্রমহাশয় কেবল বড়োলোক। এবং যেহেতু মিত্রমহাশয়ের ধারণা যে দরিদ্র যুবক ও যুবতীরা প্রেমের মতো কোনো সূক্ষ্ম অনুভূতির অতীত, সেহেতু তিনি অনুমান করেন যে বাঙালী কবির কবিতার প্রেরণা নিশ্চয়ই কোনো স্বাস্থ্যবতী মোটরযানবিহারিণী। বাঙালি কবিরা কাদের জন্য লেখেন, বাংলাভাষায় কোনো রচনা কারা পড়ে এ-সম্পর্কে মিত্রমহাশয়ের আবিষ্কার চমকপ্রদ: "তবে কি তাঁরা কবিতা লেখেন বাংলাদেশের অঙ্গুলিমেয় সেই মিহিন উচ্চবিত্ত সমাজেব জন্য, যেখানে কেরানিরা কাজে কতটা ফাঁকি দেয় তা নিয়ে বিশ্রম্ভালাপ চলে, বাঙালিদের অভ্যাস কত নোংরা তা নিয়ে বিবমিষা থেকে অন্য-আরেক বিবমিষার মধ্যে মন্তব্য বিনিময় চলে, ঘেরাও কেন দেশদ্রোহিতার সমপর্যায়ভুক্ত সে-বিষয়ে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বক্তৃতাশালায় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়, এক সন্ধ্যায় পাঁচ হাজার টাকা ঢেলে রবিশংকরের সেতারঝংকার শোনা হয়, জটলা চলে কী-ক'রে মজুরদের অর্জিত বোনাস আইনের মারপ্যাঁচে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব। কবিরা যদি মুখোমুখি বলেন, তাঁদের রচনা আমার-তোমার জন্য নয়, তাঁদের প্রেমিকা এই নিরালম্ব নপুংসক সমাজের, সুতরাং তাঁদের কবিতার গহনে পৌছোনো আমার-তোমার প্রতিভার বাইরে, তাহ'লে তো সঙ্গে-সঙ্গে মামলা শেষ, সৌজন্য জিনিশটাকেও তাহ'লে অচিরে শিকেয় তোলা চলে। তাহ'লে কণ্ঠে যথাযথ বিষ ঢেলে নিয়ে বলতে পারি: শূকর সন্তানের দল, চলো, তোমাদের কবিতাকে শ্মশানে রেখে আসি, রেখে এসে আমাদের নিজেদের একান্ত-কবিতায় ব্যাপৃত হই, যে-কবিতা মিছিলের সগোত্র, যে-কবিতা মিছিলের শরীরের সঙ্গে একাকার হ'য়ে মিশে যাক এরকম আমাদের তুঙ্গতম প্রার্থনা।" (পৃ. ৩৭)

এই অংশটি সবিস্তারে উদ্ধৃত করলাম কারণ এটি মিত্রমহাশয়ের বক্তব্যের আকরবিশেষ; এখানে তাঁব রচনাব গুণ ও দোষ উভয়ই স্পষ্ট। গুণ, যে তিনি তাঁর মত রুদ্ধশ্বাস দ্রুততার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেন. গুণ, যে তিনি তাঁর সমগ্র অস্থির ব্যক্তিত্ব, ও তাঁর দুর্বলতা, দুঃখ, সাধ, অপরাধবোধ সব অকপটে প্রকাশ করে ফেলেন। আর এটাই আবার প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর দুর্বলতাও বটে। তাঁর যে-অসতর্কতার জন্য আমরা অনুমান করতে পারি মানুষ অশোক মিত্রটি ঠিক কেমন, তিনি কোন গোপন যন্ত্রণায় এত ব্যর্থভাবে ছটফট করেছেন, আবার ঠিক সেই অসতর্কতার জন্যই তাঁর যুক্তি বিশৃঙ্খল ও অস্বচ্ছ থেকে যায়। উপরের অংশটির প্রারম্ভে তিনি শুরু করেছিলেন একটি ভুল অনুমান দিয়ে, সেটাকে শেষে তিনি কল্পনা করে নিলেন তথ্য বলে, এবং তার ভিত্তিতেই আজকের বাংলা কবিতাকে দিলেন শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার রায়। বাংলা কবিতার পাঠক ঐ অঙ্গুলিমেয় মিহিন সমাজ নয়, এবং পাঠকের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়ও নয়। বস্তুত, মিত্রমহাশয়ের এই স্বীকারোক্তি পাঠের আগে, এটাও অনুমান করা কঠিন ছিলো যে ঐ মিহিন সমাজের মধ্যে এমনকি একজনও কবিতা পড়েন।

একজন অনন্ত পড়েন। কারণ, স্পষ্টতই, মিত্রমহাশয় স্বয়ং ঐ সমাজের একজন;

একচল্লিশ পৃষ্ঠায় নিজের যে-ছবি তিনি এঁকেছেন, তা ছাড়াই আমরা জানতে পারি যে তিনি ঐ সমাজের একেবারে ভেতরকার লোক, এমনকি সেখানে কী ধরণের গোপন বিশ্রম্ভালাপ চলে তাও তিনি জানেন। শুধু তাই নয়। ঐ সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের একটি যে-লক্ষণ তিনি উল্লেখ করেছেন তা তাঁর রচনার সর্বত্র। তাঁব প্রবন্ধটির প্রথম থেকে শেষ আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে বাঙালী মধ্যবিত্ত চরিত্র। এই হেজে-যাওয়া বাংলাদেশে এমনকি মিছিল পর্যন্ত বিশুদ্ধ থাকে না, তা কবিতার দ্বাবা আক্রান্ত হয় এই হলো মিত্রমহাশয়ের গভীব মনীষা থেকে উত্থিত সিদ্ধান্ত। বাঙালীরা দ্রব, বাঙালীবা অলস, বাঙালীরা ন্যাকা—জাতিচরিত্র বিষয়ে এগুলির সত্যাসত্য আমি এখন আলোচনা করতে চাই না; আমি শুধু এই ধরণের আক্রমণেব সার্থকতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে চাই।

বাঙালী ও ভারতীয় জাতিচরিত্র নিয়ে এই প্রকার আক্রমণ দেশে ও বিদেশে এক বিপুল শিল্পের আকার ধাবণ করেছে। অবশ্যই ভাবতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ও চরিত্র চিত্রণেব প্রয়োজন আছে; প্রয়োজন আছে নিরুত্তাপ ও তথ্যানুগ আলোচনাব; প্রয়োজন আছে, তার কারণ আমবা বুঝতে চাই কেন বাঙালী মধ্যবিত্ত একভাবে আচরণ করে এবং কেন কোনো ফরাসী কি ইংবেজ সেভাবে করে না। কিন্তু এ নিয়ে এত উষ্মা, এত বাগাবাগি, এত চোটপাট কেন? পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ইংলন্ড হয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন কোনো-কোনো অক্লান্ত লেখক এই নিয়ে দুঃখ করতে যে ভারতীয়েরা নোংরা। আবার অন্য কেউ কলকাতা ত্যাগ করে দিল্লি হয়ে চলে যান সুদূর ইংলন্ড এই নিয়ে আক্ষেপ করতে যে ভারতেব জলবায়ুই এমন যে এই উপমহাদেশের অধিবাসীরা অলস হতে বাধ্য। এই ক্রোধ, এই আক্ষেপ নিতান্ত নিষ্ফল। যদি বস্তুতই বাঙালী চরিত্র যেরূপে চিত্রিত হয় তাই হতো, তাহলেও এবকম আক্রমণের কোনো সার্থকতা থাকত না। তাকেই আক্রমণ করার অর্থ হয় যা সংশোধনীয়, যা পরিবর্তনীয়; মানুষের বুদ্ধি, তার উদ্ভাবন, তার কর্মক্ষমতা, আলস্য কি নিরলসতা, পৃথিবীর সবদেশে ও সবকালে এক। সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে এইগুলিতে যে ভিন্নতা লক্ষিত হয়, তার কারণ মনুষ্যচরিত্র নয়, তার কারণ সাংগঠনিক পরিবর্তনের। এবং যাঁরা কোনো দেশের জলবায়ু নিয়ে আক্ষেপ করেন, কিংবা জাতিচরিত্রের দোষ দেন, তাঁরা শুধু যে সেই দেশের দীন ও ক্লিষ্ট অধিবাসীকে অহেতুক আঘাত করেন তাই নয়, তাঁরা পরিবর্তনেরও প্রতিবন্ধক। কারণ, যদি বাঙালী সমাজেব এই দুর্দশার কারণ কেবল নৈসর্গিক কি চারিত্রিক হয়, যদি আইন কানুন কি কোনো পরিবর্তনের দ্বারা এই সমাজের উন্নতি অসম্ভব, তবে হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। শুধু প্রার্থনা করা যায় কোনো সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো ভারতবর্ষ উত্তরমেরুর আরেকটু সন্নিকটবর্তী হবে। তখন আবহাওয়ার পরিবর্তনহেতু বাঙালীরাও নিরলস, সত্যবাদী ও মিতব্যয়ী হবে। অথবা এমন স্বপ্ন দেখা যায় যে বংশে-বংশে পুরুষানুক্রমিক বিবর্তনের ফলে বাঙালীব মজ্জায়-মজ্জায় যে-ক্লীবতা কিংবা যে-কবিত্ব ঢুকে গেছে তা দূর হবে, সহস্র কি লক্ষ বৎসরব্যাপী এই বক্তশোধনের ফলে বাঙালী মধ্যবিত্তও চবিত্রগুণে চৈনিক কৃষিজীবীর মতোই উৎকৃষ্ট হবে। "এই

দুশ্চরিত্র, লম্পট আমিও মিছিলে... অসাধুতা হয়তো আমার অস্থিমজ্জাগত... তবু মিছিলে এই আশায় যে আমরা রক্ত বংশানুক্রমে পবিত্র থেকে পবিত্রতর হবে, একদিন আমার রক্ত ভুলবে তার মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্বার্থকলুষ-করা ঐতিহ্য। এমন হ'তে-হ'তে একদিন মিছিলে আমার মতো আরো যাদের রক্ত, তাদের সংখ্যা ক্ষ'য়ে গিয়ে সামান্যে ঠেকবে, কৃষিজীবী-মজুরের রক্ত আমাদের হারিয়ে দেবে। পাটাতনে দাঁড়িয়ে তখন যাঁরা বক্তৃতা দেবেন, তাঁদের বচনে আর কবিতা থাকবে না, মিছিলের কাব্যমুক্তি ঘটবে।" হায়, রোমান্টিক অশোক মিত্র। রক্তের বিশুদ্ধতা নিয়ে তাঁর এত মাথাব্যথা দেখে হের এডলফ হিটলার নিশ্চয় অতিশয় আহ্লাদিত হতেন।

২

তাঁর খিস্তির অংশ বাদ দিলে, কবিদের সম্পর্কে মিত্রমহাশয়ের প্রধান আপত্তি মোটামুটি এই দাড়ায়: বাংলাদেশের এখন এতই দারিদ্র্য যে সেখানে প্রেম-বিরহ, কাব্যচর্চা, দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা ইত্যাদি অশোভন ও অসম্ভব। "সংসারে সংস্থান নেই, দেড়শো দুশো টাকা আয়ে এক বাবা এক মা তিন ভাই এক পুত্রবধূ দুই অনূঢ়া বোন তিন ভ্রাতুস্পুত্র-পুত্রীব অন্নের যোগান, ভাইয়ের বেকার ব'সে থাকা, বাবার যক্ষ্মা, বর্ষায় শৌচাগারের শয়নঘরের একাকার হ'য়ে যাওযা, অভাব, মেজাজ খারাপ, পরস্পরকে দোষারোপ, কান্না, তিক্ততা, মনের সুকোমল বৃত্তিগুলি ধীরে-ধীরে শুকিয়ে আসা। এই পরিবেশে এমনকি তেইশ বছরের আপাত উঠতি শরীরেও, স্তন আর স্তন থাকে না, দু-দিনেই তা হেলে প'ড়ে মাই হয়ে যায়।" (পৃ. ৩৬)।

এই অংশে মিত্রমহাশয়ের নানান শব্দ ব্যবহার নিয়ে রসিকতা করা যায়, কিন্তু তাঁর সামগ্রিক বাক্তব্যটি এমনই স্নবারিদুষ্ট, শ্রেণীভেদসূচক ও নিষ্ঠুর যে পরিহাসের সব ইচ্ছে চলে যায়। দারিদ্র্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং তা অবিলম্বে পৃথিবী থেকে দূর হওয়া বাঞ্ছনীয়। মিত্রমহাশয় যদি এও বলেন যে দারিদ্র্য বাংলাদেশের এক নম্বর সমস্যা, এবং প্রত্যেকের যথাসাধ্য এটা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত, তাতেও নিশ্চয় সবাই একমত হবেন। কিন্তু দারিদ্র্যের যে-চিত্রটি তিনি এঁকেছেন তা সম্পূর্ণ ধনীর দৃষ্টিতে দেখা; আমরা এতকাল জানতাম গরিবের শুধু টাকা নেই; অশোক মিত্র আবিষ্কার করেছেন যে তার হৃদয়ও নেই, এত অভাবের মধ্যে হৃদয় থাকতে পারে না। যেখানে শয়নাগার শৌচাগার একপশলা বৃষ্টির পরে একাকার হয়ে যায় সেখানে দর্শন কি কবিতা কি প্রেম অসম্ভব। যেখানে এতগুলি অভুক্ত পেট, সেখানে সমবেদনা কি স্নেহ কি ত্যাগ কি বাৎসল্য থাকতেই পারে না। মিত্রমহাশয়ের থাকতে পারে অধিকার কবিতাকে ভালোবাসার, কবিতা-বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার। কিন্তু ঐসব মানুষগুলো যারা প্রায় জন্তুর মতো জীবনযাপন করে তাদের প্রথম কর্তব্য তাদের পরিবেশের উন্নতিসাধন; যখন তারাও মিত্রমহাশয়ের তুল্য আর্থিক সাচ্ছল্য অর্জন করতে পারবে অবশ্য তখন নিশ্চয় তাদের পক্ষে কবিতা ইত্যাদি বিষয়ে মাথা ঘামানো শোভন হবে।

মিত্রমহাশয়ের বক্তব্যের সঙ্গে আমি আরেকজন দিল্লিবাসী বাঙালীর মতের ঐক্য লক্ষ করি। ঐ দ্বিতীয় মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় জনৈক শ্বেতাঙ্গের বাড়িতে; উপলক্ষ এক নৈশ ভোজ; কাল গত শীত ঋতু। আমার সেখানে পৌঁছুতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়; গিয়ে দেখি মহাশয়টি লণ্ডনের বন্ড স্ট্রিটে ক্রীত তাঁর পাদুকাদ্বয় মহা গর্বের সঙ্গে প্রদর্শন করছেন। আমি বলি যে আমার বিলম্বের কারণ গড়িয়া থেকে যে-জীর্ণ বাসে আসছিলাম এই দীর্ঘ পথের মাঝে তার কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল। মহাশয়টি তৎক্ষণাৎ মন্তব্য করলেন যে গড়িয়া থেকে গড়িয়াহাটে যেতে উদ্বাস্তু পল্লীগুলির যে-দৃশ্য চোখে পড়ে তা দেখে তাঁর ন্যক্কার উদ্রেক হয়। ঐ পরিবেশে কি মানুষ বাস করতে পারে!

ঐ 'দৃশ্য' বহুবার দেখেছি; আমার অসংখ্য বন্ধু ও আত্মীয়জনকে ঐখানে বাস করতে হয় বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু আমার নিজেরও বাস যেহেতু কোনো প্রাসাদে নয়, সেহেতু এটা আমার জানা আছে যে বর্ষায় প্লাবিত উঠোনের মধ্য দিয়ে ছপাৎ-ছাপাৎ করে হাঁটার সময়ও বুকে কারোর জন্য ভালোবাসা থাকতে পারে, মাথায় ঘুরতে পারে কবিতার লাইন। ঐ 'দৃশ্য' মোটেই ঘৃণ্য নয়, বরং যে এরকম উক্তি করতে পারে, যে তার আপেক্ষিক সচ্ছলতাবশত অপর মানুষের সম্পর্কে এত অজ্ঞ হতে পারে, সেই ব্যক্তিই ঘৃণ্য। আমি তো গড়িয়ার পথে যেতে-যেতে ঐ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও অজেয় মানবহৃদয়ের প্রকাশ দেখে গর্বিত বোধ করি; পথে-পথে রাজনৈতিক পোস্টার, নাটকের বিজ্ঞপ্তি, উত্তমকুমারের সংবর্ধনার আয়োজন, পুজো, যাত্রা, চলচ্চিত্র-উৎসব। রাস্তা ডুবে গেছে, বিদ্যুৎ ক্ষীণপ্রভ, ধোঁয়া, ক্লেশ, পরিশ্রম ক্ষুধা, এসব আছে বটে কিন্তু এই অপরাজেয় মানুষগুলি তার মধ্যেও গান গাইছেন, যাত্রা ও নাটক ও মিছিল করছেন, কবিতা লিখছেন, করছেন পত্রিকা প্রকাশ। এঁদের হৃদয় ও কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব অন্য কারো চেয়ে কম নয়।

বরং আলিপুর থেকে চৌরঙ্গীতে, কিংবা পার্ক স্ট্রিট থেকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড যেতে মিত্রমহাশয়ের ন্যক্কার উদ্রেক হওয়া উচিত। অত বড়ো-বড়ো বাগানওলা বাড়িতে কত কম লোক বাস করে। যেখানে মানবশিশুদের খেলার জায়গা নেই, সেখানে ঘোড়দৌড়ের জন্য এত বড়ো প্রান্তর! যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক চিলতে জায়গা নেই, সেখানে গঙ্গার তীর জুড়ে ফোর্ট উইলিয়ামরূপ সপ্তদশ শতাব্দীর এক জাদুঘর! বালিগঞ্জে সাহেবদের রোববারে ক্রিকেট খেলার জন্য সারা সপ্তাহ ধরে মালিরা মাঠে জল দেয় ও পাড়ার বালকদের হাত থেকে বাগানের ফুল রক্ষা করে। ঐ মাঠের পাশেই আরেক মাঠ; যেখানে কয়েকটি নিদ্রিত কামান ত্রিপলের মশারির তলায় অগ্নিস্রাবী স্বপ্ন দেখে। টালিগঞ্জের গল্ফ ক্লাব ও পক্ষীশালা, আলিপুরের কারাগার, রাজ্যপালের প্রাসাদভবন। এ দেখে কারো যদি ন্যক্কার উদ্রেক হয় তো বুঝি; কিন্তু যাদবপুরে কি দমদমে— সরকারের সহায়তা দূরে থাক, অনুমোদন বিনাই—সহস্র-সহস্র নিঃসম্বল মানুষ জলাভূমিকে যে বাসযোগ্য করে তুলেছেন, এবং অত স্বল্পস্থানের মধ্যে যে এতজন আশ্রয় লাভ

করেছেন তাতে মিত্রমহাশয়দের যদি অবাক লাগে তবে তা কেবল সানন্দ বিস্ময় হওয়া উচিত।

তা তাঁরা কেন করেন না? কেন তাঁরা মনে করেন যে যাদবপুরের জীবন পশুরও অযোগ্য, এবং সেহেতু সেখানে যারা বাস করে তাদের কবিতার বিলাসিতা না-করে একাগ্রমনে ঐ পরিবেশ উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা উচিত? আমাকে একদা এক করুণাময়ী শ্বেতাঙ্গ রমণী এশিয়া ও আফ্রিকা ভ্রমণের পর সাশ্রুনয়নে এই ভর্ৎসনা করেছিলেন: 'তুমি বুদ্ধিমান ও বিবকবান যদি হও তবে তোমার দেশবাসীর উন্নতির জন্য আগে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য; কবিতা লেখা তোমার পক্ষে স্বার্থপরতা।' আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে কবিতা লেখার সঙ্গে দেশের উন্নতির কোনো বিরোধ নেই; কবিতা লিখে আমি কারো কোনো পাকা ধানে মই দিচ্ছি না; এবং যদিও আমার বিশ্বাস মানবসমাজের বিবর্তনে পরোক্ষভাবে কবিতারও অবদান আছে, যদিও আমি বিশ্বাস কবি যে মানবচৈতন্যের বিকাশ অর্থনৈতিক উন্নতির মতোই কাম্য, আমি আমার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব নিতে অন্য সকলের মতোই প্রস্তুত। কেবল কারখানায় কি বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ব্যাঙ্কে কাজ করার পর রাত্রি জেগে যদি আমি কবিতাও লিখি, তবে আমি কি এমন স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছি?

কিন্তু যে-প্রশ্ন আমি স্বাজাত্যাভিমানবশত সেই মহিলাটিকে করতে পারিনি আজ হৃদয়বান মিত্রমহাশয়দের করতে চাই। মহিলাটির তিরস্কারের পশ্চাতে একটি অনুক্ত সিদ্ধান্ত ছিলো: তুমি যেহেতু ঐ মহাদেশের মানুষ, সেহেতু তথাকার অবস্থার জন্য কেবল তোমার বিবেকপীড়িত হওয়া উচিত, আমার নয়। আমার যেহেতু ইওরোপ কি আমেরিকা মহাদেশে জন্ম, আমি কবিতা লিখতে পারি, প্লেটো-নীটশে আওড়াতে পারি, আমি শুনতে পারি উৎকৃষ্ট সংগীত। আমার দেশের যুবকদের অধিকার আছে চৈতন্যের সীমান্তদেশ থেকে নবতম কবিতা কি নাটক উদ্ধার করে আনার। তাদের অধিকার আছে দার্শনিক কি সংগীতকার কি কবি হওয়ার; কিন্তু তোমার মহাদেশ যেহেতু দরিদ্র, সেহেতু রুটির চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো চেতনায় তোমার অধিকার নেই।

কিন্তু যে-নৈতিক মানে আমি আমার শহরের, কি রাজ্যের, কি দেশের, কি মহাদেশের অন্যায় ও উৎপীড়নের জন্য দায়ী? সেই নৈতিক মান কি বিভাজ্য? আমি কি কেবল আমার গ্রাম কি পাড়ার জন্য দায়ী? তোমার সমবেদনার সীমারেখা কি তোমার মহাদেশ? তোমার যদি এই অদ্ভুত ধারণা হয়ে থাকে যে ভারতবর্ষের কোনো যুবকের অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা মহাপাপ, তবে সেই পাপ সুদূর ফিনল্যান্ড কি সুইডেনবাসী কবিকে স্পর্শ করে। এবং যদি কবিতা বিষয়ে চিন্তা করার অধিকার যাদবপুরবাসী 'বাচ্চা কবি'র না থাকে, তবে কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার নৈতিক অধিকার দিল্লিবাসী বয়োবৃদ্ধ অশোক মিত্রেরও নেই।

মিত্রমহাশয় যদি সেই অধিকার যাদবপুরবাসী দরিদ্র শিক্ষক কি কেরানিকে দিতে প্রস্তুত না-থাকেন, তবে তার কারণ তিনিও ঐ মহিলাটির অনুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ফ্রান্স দরিদ্র, ফ্রান্সের তুলনায় গ্রীস, গ্রীসের তুলনায় মিশর, মিশরের তুলনায় সিংহল, সিংহল ও পৃথিবীর অপর দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ। কোন দেশের তুল্য মাথাপিছু আয় ভারতবর্ষে হলে তবেই আমরা জন্তুর পর্যায় থেকে মানুষের স্তরে উঠব, যখন আমাদেরও অধিকার হবে কবিতা লেখার? দারিদ্র্য ও ধন, দুটোই আপেক্ষিক; হয়তো একুশ শতকের ইস্রেলের তুলনায় আমেরিকার বর্তমান মাথাপিছু আয়ও তুচ্ছ মনে হবে; কোন সেই সীমারেখা যা অতিক্রম না-করলে মানুষের 'সুকোমল বৃত্তিগুলি' শুকিয়ে যায়? মিত্রমহাশয় "আজীবন কবিতা ভালোবেসেছেন বা ভালোবাসতেন" ; কিন্তু উদ্বাস্তু পল্লীবাসী যুবকের সে-অধিকার নেই। কোন আর্থিক মান অতিক্রম করলে, মিত্রমহাশয়ের উপার্জনের কত কাছে পৌঁছুলে, যুবকটিও কবিতাকে ভালোবাসার ক্ষমতা অর্জন করবে? কোন সেই অঙ্ক যা মাসে-মাসে বেতন পেলে মানুষের মতো জীবন ধারণ করা যায়, ভুলে যাওয়া যায় যক্ষ্মা, অনাহার ও আশ্রিত স্বজন, যখন থেকে বলা যায় অবশেষে আমি এই বাচার সংগ্রাম থেকে উর্ধ্বে উঠেছি, এখন থেকে আমি কবিতারূপ বিলাসিতা করতে পারি—হায়, অশোক মিত্র, আপনার অকথিত আত্মতৃপ্তিরও সেহেতু কোনো কারণ নেই। কোনো বিড়লা কি টাটার মনে হতে পারে আপনি যেরূপ কষ্টে-সৃষ্টে কোনোমতে 'এক বাবা-এক মা', দুটি ভাই, একটি পত্নীর বিশাল পরিবার ঐ সামান্য উপার্জনের উপর চালান, তাতে আপনারও সব সুকোমল বৃত্তিগুলি শুকিয়ে আসতে বাধ্য, আপনারও অধিকার নেই কবিতাকে ভালোবাসার।

কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ টাকা মাইনে হলেই যেমন কেউ জন্তু হয়ে যায় না, মাত্র পাঁচশো টাকা, কি মাত্র পাঁচ হাজার টাকা বেতন যারা পায় তাদেরও জীবনে কখনো প্রেম আনে তীব্র সুখ, বিরহ দেয় যন্ত্রণা, তাদেরও আছে মৃত্যুভয়, তারা জরাগ্রস্ত হয়, আছে তাদের জীবনেও ঋতু পরিবর্তন, সূর্যাস্ত। আমাদের আসল সুখ-দুঃখ বস্তুর উপস্থিতি কি অভাবের উপর নির্ভর করে না, মানবজীবনের আসল সার্থকতা অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। শারীরিক ক্লেশ কি স্বাচ্ছন্দ্য এক জিনিস; আমাদের দুঃখ কি আনন্দ অন্য রহস্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্লেশ মানুষ হাসিমুখে সহ্য করতে পারে, কিন্তু ক্ষমতাবানের উৎপীড়ন কি অসমের অপমান মানুষের শরীরে শুধু বাজে না, প্রাণে গিয়ে বিদ্ধ করে। এবং মানুষের দুঃখ ও যন্ত্রণার প্রকৃত কারণ যেমন অপর মানুষ, তেমন তার সকল আনন্দের কারণও অপরের তৃপ্তি ও স্নেহ ও ভালোবাসা ও বন্ধুতা ও শ্রদ্ধা। সেহেতু দারিদ্র্যের সঙ্গে ক্লেশের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু দুঃখের নেই। যে-সমস্ত স্বেচ্ছানিযুক্ত দীনবন্ধু দারিদ্রকে দূর করার অছিলায় গরিবের প্রতি স্নেহ-পরবশ হয়ে দারিদ্র্যকে নিরানন্দ, স্নেহমমতাহীন জন্তু বলে অখ্যাত করেন তাঁরা না-বোঝেন দরিদ্রকে, না-বোঝেন নিজেদের। কারণ, দরিদ্রকে এইভাবে করুণা করে তাঁরা এক গভীর আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন।

ধনীর জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পারে, তারও থাকতে পারে ভালোবাসার ও স্নেহের জন ও সেহেতু তারও জীবনে থাকতে পারে আনন্দ, কিন্তু ধনী হিসেবে

দরিদ্রের চেয়ে তিনি সুখী কেবল একটি কারণে: তিনি মোটর গাড়িতে চড়েন অন্যেরা সবাই যখন স্বপায়ে হাঁটে। মানুষের অহংবোধ দুই উপায়ে তৃপ্ত হয়ে তাকে সুখ দেয়: অপরকে ভালোবেসে, অথবা অপরকে নির্যাতন করে। তার মিত্রের উন্নতিতে সে যেমন সুখী, তার শত্রুর বিড়ম্বনাও তাকে তেমনি আনন্দ দেয়। অথচ, দ্বিতীয় উপায়ে সে যে-সুখ পায় তা তাকে প্রকৃত তৃপ্তি দেয় না; অপরের উপর জোর করে নিজের ইচ্ছে চাপিয়ে দিয়ে, সকলকে নিজের বশীভূত করে, সবাইকে নিজের ভ্রূকুটির ভয়ে কম্পমান ও পদানত করে যে মানুষের প্রকৃত সুখ হয় না তা পৃথিবীর প্রতিটি স্বৈরাচারী হিটলার ও স্টালিনের জীবন প্রমাণ করেছে। উভয়েই শেষ জীবনে প্রতিটি ছায়ার ভয়ে কাঁপতেন, প্রত্যেককে করতেন অবিশ্বাস, ক্ষীণতম মতান্তরকে মনে করতেন গভীর শত্রুতার পরিচায়ক। কোনো দীনতম সন্ত এই অপার ক্ষমতাময় রাষ্ট্রপিতার চেয়ে প্রকৃত অর্থে অধিক সুখী।

আমি যে-কথাগুলি এখন বলছি তা স্বকীয় নয়, তা বহু মানুষ বলে গেছেন; এবং তৎসত্ত্বে জগতের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এবং অশোক মিত্র, এবং সমমতাবলম্বীদের, এই প্রবন্ধপাঠে কোনো পরিবর্তন হবে এমন আশা আমার নেই। তাঁর মিত্রেরা তাঁকে তাঁর সৎসাহসের জন্য তারিফ করবেন, কারণ তাঁরা ঐ মিছিলের স্লোগানের মধ্যে খুঁজে পাবেন নিজেদের অব্যক্ত আর্তির প্রতিধ্বনি। এবং এই প্রবন্ধে মিছিল, বিপ্লব ও সামাজিক পরিবর্তনের বিরোধিতার অসংখ্য বক্র ও গুপ্ত যুক্তি আবিষ্কার করে তাঁদের প্রগতিশীল বিবেক এতই তৃপ্তি পাবে যে তাঁদের নিজেদের জীবনপ্রণালীর তিলতম পরিবর্তনের প্রয়োজনও যে থাকতে পারে তাও তাঁরা নির্দ্বিধায় ভুলে যেতে পারবেন। আর যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধমতাবলম্বী তাঁদের এই প্রবন্ধ বিষয়ে যদি কোনো আপত্তি থাকে তা এই: লোকটি নাকি নকশালপন্থী, লোকটিকে আরো একহাত নিল না কেন লেখক!

আমি যা লিখছি তা এই আশায় নয় যে যার যা মত তা সে অবিলম্বে ত্যাগ করবে। মতের পরিবর্তন হয় খুব ধীরে-ধীরে, এবং তা অন্য কারো কথায় আসে না, তা আসে নিজের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। আমি লিখছি এই আশায় যে মিত্রমহাশয় যে-রকম মানুষ মনে হয় তাঁর লেখা থেকে, যেরকম খণ্ডিত ও দোদুল্যমান তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাতে স্পষ্ট যে তিনি এখনো সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাননি, নিজের অস্তিত্বের অর্থ ও মূল্য নিয়ে তাঁর এখনো সংশয় আছে। তাঁর মত এর ফলে পরিবর্তিত হবে এই আশায় করছি যে তাঁর লেখার অনুমানভূমি তাঁর সামনে স্পষ্ট করে মেলে ধরলে তিনি হয়তো আরেকবার আত্মসমীক্ষায় প্রবৃত্ত হবেন। স্পষ্টতই, নিজেকে নিয়ে মিত্রমহাশয় অসুখী। অন্যেরা মানুষের যোগ্য জীবনযাপন করছে না, এই নিয়ে তিনি কেবল অপরকে তিরস্কার করছেন না, নিজেকেও করছেন: "তাছাড়া, ভড়ংবাজির বাহারপনায় নিজের পরিচয় খুব বেশিক্ষণ ভাঁড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যে-আমি এই উক্তিগুলি করছি সেই আমি হয়তো নিরাপদ সরকারি চাকরি করি, বাংলার আকাশের ঘনঘটা আমাকে ছোঁয় না, দুঃসাহসী সামান্য কয়েকজনও বাংলাদেশে তীরধনুক কি

গোলাবারুদের মারফত বিপ্লবের কাছে একলব্যদক্ষিণা দিচ্ছে, আমি তখন দিল্লিতে কি লখনউতে, ইয়োরোপে অথবা মার্কিনদেশে; মধ্যবিত্ত বাঙালিরক্ত আমার ধমনীর প্রবাহে, খোলসের পর খোলস আমি ধারণ করছি, ছাড়ছি, ফের পরছি; অসাধুতার এতগুলি স্তর আমি অতিক্রম ক'রে এসেছি যে খোলসের একেবারে নিচে কোনো চেতনা যে একদিন ছিলো তার এতটুকু স্মৃতিও এখন নেই।" (পৃ. ৪১)

ছিল মিত্রমহাশয়, এবং এখনো, আপনি সরকারি চাকরি করা সত্ত্বেও আছে। কেবল আপনি এত ব্যর্থতাবোধে কাতর যে এখনো উপলব্ধি করতে পারছেন না কী উপায়ে সেই চেতনাকে ঊর্ধ্বে আনা যায়। কেন এই দেশে এত অন্যায়, এত অবিচার, এবং কী উপায়ে তার সংশোধন সম্ভব, তা যদি মিত্রমহাশয় ভেবে দেখেন —অন্য কারোর উপর দোষারোপ করাব জন্য নয়, নিজেকে নিয়ে বিলাপ করার জন্য নয়, কেবল সত্যকে বোঝার জন্য— তবে এটা তাঁর কাছেও স্বতঃসিদ্ধ মনে হবে যে বাংলাদেশের এই হালের জন্য কারো রক্তের দোষ দিয়ে লাভ নেই। বাঙালীরা অন্য যে-কোনো জাতির চেয়ে চরিত্র কি অন্য কোনো গুণে খারাপও নয়, ভালোও নয়। আমরা আজ যেখানে পৌঁছেছি তার জন্য আমাদের ইতিহাস, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সমাজ দায়ী। এবং এই অবস্থার পরিবর্তন কাউকে গাল দিয়ে হবে না, কী উপায়ে পরিবর্তন আসবে তা নির্দেশ করার ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু পরিবর্তনের প্রথম ধাপ হিসেবে বাস্তব অবস্থাটি ঠিক কী তা বোঝা কর্তব্য। সেইটিই নয় এখন অবলম্বন করা যাক? বিপ্লব বিপ্লব বলে যাঁরা চিৎকার করছেন তাঁরাও বাঙালী, ও এই সমাজেরই মানুষ। এমনকি কানু সান্যাল পুলিশ ইন্সপেক্টরকে ইংরেজীতে সম্বোধন করেন এবং শ্রেণীহীন সমাজের এই সৈনিকটিও রাজবন্দীরূপে জেলখানায় প্রথমশ্রেণীভুক্ত হওয়ার দাবি জানান। আমাদের দেশবাসীর এক বিপুল অংশ,— তাদের চাষী কি মজুর হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না—অর্থনৈতিক শুধু নয়, মানসিক দাসত্বে শৃঙ্খলিত। এবং উচ্চবর্ণের মধ্যে রয়ে গেছে এক শৃঙ্খলিত ও বঞ্চিত সমাজ; তাদের পশ্চিমী অর্থে 'শ্রেণী' বলা যায় না, কিন্তু মনু কি পরাশর তাদের ভিন্ন ও নিম্নস্থান নির্দেশ করে গেছেন: ভারতীয় নারী। সমস্যার আমাদের অভাব নেই। সমালোচনা ও আক্রমণের যোগ্য পাত্রও যথেষ্টই আছে। মিত্রমহাশয় বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ। তিনি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও আমলাদের একেবারে ভেতরের খবর জানেন। তাঁর তো উচিত আমাদের যাঁরা নেতা, যাঁদের হাতে ক্ষমতা আছে, যাঁরা দেশকে এক পথ ছেড়ে অন্যপথে চালিত করতে পারেন, তাঁদের অক্ষমতার ও স্বার্থান্ধতার ও নির্বুদ্ধিতার সমালোচনা করা। শুধু চোটপাট করে নয়, তথ্য ও যুক্তি দিয়ে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে তিনি এই ক্ষমতাবান শত্রুদের অভিযুক্ত করতে পারতেন। তিনি লিখতে পারেন রিপোর্ট টাটার বিরুদ্ধে। স্বতন্ত্র, ও কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে। তাঁর নিজস্ব বিভাগে গাফিলতি ও জোচ্চুরির বিরুদ্ধে হতে পারেন সোচ্চার। মিত্রমহাশয় বড়ো বদরাগী। কিন্তু কই এদের বিরুদ্ধে তাঁকে তো বেশি রাগতে দেখলাম না।

প্রধানমন্ত্রী-ঠাকুরানীর কাছে মিত্রমহাশয় সরকারি নথিপত্রে কী কী অশালীন মন্তব্য লেখেন জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে "এই সব কবির পালের কাব্য মকশো করার খাতা যদি আমার হস্তগত হ'তো" তিনি কি রিপোর্ট দিতেন। "আমি নির্দ্বিধায় প্রত্যেকটি কবিতার নিচে মন্তব্য জুড়ে দিতাম "শূকরসন্তান, তুমি একশোতে শূন্যেরও কম পেলে"। এটি তিনি "নির্দ্বিধায় প্রত্যেকটি কবিতা" বিষয়ে বলতেন কেবল রক্তে এক "নির্মল উত্তেজক" অনুভব করার জন্য। কিন্তু তা কেবল তিনি গোপনে করতে পারেন, প্রকাশ্যে নয়। "শেষ পর্যন্ত আমার সাহস আমার প্রত্যয়কে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সুড়ুৎ ক'রে কেটে পড়বে, শূকরসন্তানকে শূকরসন্তান ব'লে অভিহিত করার মতো নির্মল উত্তেজক আমার থাকবে না, বাঙালি রক্ত আমাকে বশীভূত, বংশবদ ক'রে আনবে।" এবং, কেন তিনি কবিদের ঐ মাংস ও চর্বিময় জন্তুর সন্তান বলে অভিহিত করতে চান? কারণ "কবিতায় মাংস নেই, রক্ত নেই"। তিনি "আশৈশব কবিতাকে" ভালোবাসেন, যে-কবিতা মিছিলের শরীরের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে যাক এরকম আমাদের তুঙ্গতম প্রার্থনা। এরপর যে-কোনো মনস্তাত্ত্বিক মিত্রমহাশয়ের যৌন বৈকল্য সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু আমার প্রশ্ন নিতান্তই সামাজিক ও রাজনৈতিক। বস্তুতই কি বাংলাদেশ কিংবা ভারতবর্ষের, কিংবা পৃথিবীর, দুর্গতির জন্য দায়ী কেবল কবিরা? মিত্রমহাশয়ের মতো একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর বাংলা কবিতাকে তার কায়াহীন প্রেতত্ব থেকে উদ্ধারই কি প্রথম কর্তব্য? সত্যই কি আমাদের প্রধান আশার কথা হচ্ছে "কবিতা নামে যে সর্বনাশ ঘটছে তা হয়তো এখনো ঠেকানো যায়"?

এর উত্তরে আমি কেবল এটুকুই বলতে পারি: বেচারা অশোক মিত্র, তিনি নিজেও নিশ্চয় এক ব্যর্থ কবি। নইলে কবিদের কে কবে এমন মর্যাদা দিয়েছিল? এবং বাংলাদশে এটাই হয়তো স্বাভাবিক। এমনকি চৈতন্যও কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিলেন। এই দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান একজন কবিই। এবং এখনো মিত্রমহাশয় কি তাঁর বন্ধুরা যাই লিখুন, কি করুন, বাংলাভাষায় কয়েকটি কবিতা লেখা ছাড়া আর তেমন কি লেখা হচ্ছে?

অভিমানী কবির মৃত্যু

জীবনে তুষার রায়কে আমি ভালো চিনতাম না। যতবার দেখা হয়েছে, তিনি আমার সঙ্গে এত নরম ও বিনীত ব্যবহার করেছেন যে সেটা প্রায় অস্বস্তিকর, যেমন আহ্লাদী বাঘিনী খৈরী নিজে যেচে এসে যোশিপুরে কোনো ট্যুরিস্টের উরুতে মুখ ঘষলে ভদ্রলোকটি সম্মানিত বোধ করবেন, একটু ভয়ও পাবেন, আবার স্বজাতির উপযুক্ত অহংকারের অভাবে খৈরীর জন্য একটু লজ্জাও হবে। শেষের দিকে তুষার একই সঙ্গে অত্যন্ত অহংকারী ও আত্মসম্মানহীন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি নানান নেশার অধীন ছিলেন: নেশার উপকরণের প্রয়োজনে তিনি প্রার্থীরূপে এমন অনেকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন, সুস্থ অবস্থায় যাঁদের তিনি অধম জ্ঞান করতেন। সুস্থ অবস্থায়? তাঁকে ইদানীং যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কল্পনাই করতে পারবেন না যে, পর-পর তিন বছর তুষার রায় মিঃ স্যামনস প্রতিযোগিতায় অংশ নেন; এবং সারা পশ্চিমবঙ্গের পুরুষদের মধ্যে শারীরিক বল ও সৌন্দর্যে দ্বিতীয় বিবেচিত হন। এ তথ্যটি আমাকে জানান শ্রীসন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, যিনি আরো জানান যে, এই সেদিনও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তুষারদের বাড়ি খেতে গেলে, বড়দা খুব লজ্জার সঙ্গে বলেন যে, রায়দের আজ এমনই দীনদশা, বর্তমান অতিথির সম্মানে তাঁরা খুঁজে-পেতে একটিমাত্র সোনার বাটি বার করতে পেরেছেন। আমি যে তুষারকে দেখি, তিনি পারিবারিক ঐশ্বর্যের গল্প বলেছিলেন বটে, কিন্তু সে-গল্প আমাকে আকৃষ্ট করার বদলে, তাঁর প্রতি একটু বিমুখই করেছিল। 'আমার ঠাকুর্দা তাঁর আস্তাবলের ঘোড়াদের রাম খাওয়াতেন, আর আজ আমাকেই কিনা তা চেয়ে খেতে হচ্ছে'— এ-রকম কিছু একটা বলেছিলেন তুষার। পরে জেনেছিলাম, রাম-পান তুষারের সবচেয়ে ভদ্র ও নিরীহ নেশা। এগারো তারিখ দুপুরে, তাঁর সর্বসংকটে সুহৃদ নিমাই চট্টোপাধ্যায় আমাকে বরানগরে রায়েদের পারিবারিক শ্মশানে আগুনের বিছানায় শায়িত তুষারের পাশে দাঁড়িয়ে জানালেন, শেষ দিকে তাঁর আর কোনো নেশার ক্ষমতা ছিল না, আফিম ছাড়া। তুষারের ভাই বললেন, এবার তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় কবিও জানতেন এখানেই শেষ। এটা মৃত্যু নয়, এটা তিলে তিলে, বছর দশ-পনেরোব্যাপী, আত্মহত্যা।

কেন প্রতিভাবান ব্যক্তিরা এমন করেন? এরকম ক্ষেত্রে মার্কসবাদীরা প্রতিভার এই অপচয়কে বুর্জোয়া সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে ভালোবাসেন, কিন্তু সব সমাজে এবং সর্বকালে সবচেয়ে অনুভূতিপ্রবণ মানুষগুলিকেই দেখা যায় জীবনটার দুদিকে আগুন ধরিয়ে ধূমপান করতে। মায়াকভস্কি কি সোবিয়েৎ বিপ্লবের স্বর্ণযুগে আত্মহত্যা

করেননি? জগৎটা এমন একটা দ্বন্দ্বময়, তীব্র দগদগে জিনিস যে এটিকে হজম করতে অপরিমেয় মানসিক স্বাস্থ্যের দরকার। অধিকাংশ মানুষ ধূলিপড়া ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার মতো জীবনকে অভ্যেস বশে বহন করে নিয়ে যান, কিন্তু একবার ঠুলি খুললে চতুর্দিকের হট্টগোল ও পরস্পরবিরোধী গাড়ির সামনে পড়লে দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। এই সপ্তাহে রবার্ট লোয়েল নামে একজন খুব কোমল ও বিশুদ্ধ আমেরিকান কবিও মারা গেলেন। তিনি তিন-চারবার মানসিক হাসপাতাল ঘুরে এসেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিলো ষাট বছর—এই পেনিসিলিনের যুগে যা কিছুই না। তুষার মারা গেলেন তেতাল্লিশে—ঠিক যে বয়সে একটি পুরুষ তার শ্রেষ্ঠ ও পরিণত কর্মগুলিতে হাত দেয়।

আশ্চর্য এই যে, তুষারের এই মৃত্যুই তাঁর 'শ্রেষ্ঠ ও পরিণত কর্ম'। এটার জন্যই তিনি এত দিন প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর প্রতিটি কবিতা হচ্ছে এই মৃত্যুর ভবিষ্যৎ বাণী।

হলুদ সূর্যের গায়ে আমাব
হারাকিরির রক্ত লাগুক
ভাবতে ভাবতে সময়ের মধ্যে
হাত চালাই।

তিনি প্রথম থেকে তাঁর জীবনের লেভেল ক্রসিঙে গেটম্যানরূপ ঈশ্বরকে শাসাচ্ছেন :

এই বেলা বলে দিন ছাড়বেন
কিনা, এই বেলা
লাল চোখ বন্ধ করে
সবুজ জ্বালুন, নয়তো
ব্রেক মানবো না কোনো,
ধাক্কা কলিশানে
ট্রাফিক সিগনাল ভেঙে
তারপর চলে যাবো এক ট্রাক
থেকে অন্য ট্রাকে।

এবং আমরা যারা কবিত্বের অভিশাপ কিংবা বর কিছুই লাভ করিনি, আমাদের কাছে যদি এই মৃত্যু অপচয় বলে মনে হয়, তুষারের কাছে এটা পরম তৃপ্তিকর এক পরিণতি। যাঁবা ভালোমানুষ, তাঁরা তুষারের মৃত্যুতে দুঃখ পাবেন, তাঁরা নিজেদের নিয়ে তৃপ্ত, তাঁরা পরিহাস করবেন কিন্তু তুষারের মতো কবিরাই হচ্ছেন সমাজের ত্রাণ, তার বিবেক, তার আত্মার স্বাস্থ্যরক্ষাকারী উচ্চতম ট্র্যাপিজে ডিগবাজি খাওয়া ক্লাউন :

আমাকে কি এখনো চিনলে না ভীষণ খাদের বাঁকে আমিই তো
ব্রেক ...

না চিনে অথচ তোমরা ঠাঠা
করে হাসো
ভালোবাসো উল্লুকের পঞ্চম
পাঁঠাকে
অভিমানে ছিঁড়ে ফেলি
কাঁচা ব্যান্ডেজ...
এই রাগ নিয়ে আমি
এবার লাফাবো
গামাক্সিন দিয়ে মারবো
সব ছারপোকা
সব গ্যাস, তেজস্ক্রিয়া
গিলে নেব, যাতে
এই প্রিয় দেশ যেন পুনর্বার
বাসযোগ্য হয়।

কবি সত্যই তাঁর নিজের শরীরে সব গ্যাস তেজস্ক্রিয়া গিলে নিয়েছিলেন। তার ফলে এই দেশ বাসযোগ্য হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু এখানে বারবার তুষাব রায়ের মতো তীব্র অথচ পরম কোমল আত্মার প্রকাশ ঘটে বলেই এই দেশ এত প্রিয়। তুষার রায় অভিমানে তাঁর কাঁচা ব্যান্ডেজ টেনে ছিঁড়ে ফেলে মারা গেলেন। ঈশ্বর যদি এই সকল অনুভূতির অধীন হন, তবে তুষারের এই অভিমান, এই মৃত্যু, তাঁকে একটু লজ্জা দেবে। আর তুষারের কবিতার তীব্রতা ও শক্তি বাঙালিমাত্রকেই করবে গর্বিত।

ধর্ম কি বিশ্বাস বলতে একটাই—ভালোবাসা

যদিও চোখ দিয়েই আমরা দেখি, নিজের চোখের মণির রং কি কখনো দেখতে পাই? তেমন ব্যক্তিগত জীবনে যে মানুষ খুব কাছের, যিনি সব রান্না, বর্ণহীন লবণ, সব সরবতে চিনি, তাঁর কাজ ও প্রতিভার কতটুকু আমরা লক্ষ্য করি? পাতাল রেলে সেদিন প্রতিভা বসুর 'গল্প সংগ্রহ' পড়তে পড়তে পার্ক স্ট্রিট স্টেশন ফসকে যাওয়ার পর থেকে খেয়াল হল: আরে 'কবিতাভবন' নামক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি ছিলেন অবৈতনিক 'ডীন', তারও আগে, যিনি রাণু সোম (এমেচার) নামে তিরিশের দশকে গান রেকর্ড করেছেন এন্তার, তিনি কিন্তু বাংলা ভাষার একজন প্রধান শিল্পী, যাঁর বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য এখনো অনাবিষ্কৃত। তাঁর আপাত-সারল্যই তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে। তাঁর সংলাপ টলটলে ও স্বচ্ছ ও অনায়াস। মোটেই প্রথম পর্যায়ের বুদ্ধদেব বসুর মতো সচেতনভাবে স্মার্ট নয়, নয় কমলকুমার মজুমদারের মতো সাধু গদ্যের গিটকিরি কণ্টকিত। আর তাঁর বিষয়? শ্রেণীসংগ্রাম নয়, বন্ডেড লেবার সমস্যা নয়, সার্তের অস্তিত্ববাদ নয়। বুদ্ধিজীবী কি পণ্ডিতেরা আঁতকে উঠবেন শুনে কোনো কূট সমস্যা নয়, তাঁর বিষয় হচ্ছে একেবারে হাল্কা ও খটমট ল্যাটিন-সংস্কৃতহীন, পাণ্ডিত্য ও গবেষণার অতীত কিশোর-কিশোরীর ভালবাসা! বসন্ত সমাগমে বিলেতে পাখিদের প্রথম কাকলি রেকর্ড করার জন্য নানা ঝোপেঝাড়ে মাইক লুকিয়ে রাখে বিবিসি-র সংবাদদাতারা, পরে বসন্তের সেই প্রথম কুহুরব বেতারে সম্প্রচার হয়। কুয়াশামলিন লণ্ডন মহানগরীর ব্যাঙ্কার ও ল্যান্ডলেডি ও ক্যাবি ও ববি সেই পাখির ডাক রেডিওতে শুনে শীতের অবসাদ মুক্ত হয়, এক বছরের জন্য আবার জীবনচক্র সোৎসাহে ঘোরানোর উপযুক্ত টনিক সংগ্রহ করে। প্রতিভা বসুর লেখা পড়ে মনে হয়, নানান কোনায়-আবডালে তিনিও ছড়িয়ে রেখেছেন চোরা মাইক, যাতে কিশোর প্রেমের প্রথম সংলাপ তিনি নিখুঁত তুলে নিয়ে উপন্যাসের পাতায় অবিকল ছাপিয়ে, আমাদের অবসাদ হরণ করতে পারেন, ফিরিয়ে দিতে পারেন বাঁচার আমেজ ও আগ্রহ। তাঁর শ্যামলা ও রোগা 'সাধারণ' মেয়েরা এমন স্বাভাবিক যে মনেই হয় না তারা বানানো, মনে হয় তারা জীবন থেকে টোকা। তাঁর সংলাপে চোখ টাটানো সৌন্দর্য কি তীক্ষ্ণতা নেই, আছে লাবণ্য। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, নিতান্ত একটি অখ্যাত গল্প থেকে, প্রতিভা বসুর সংলাপশৈলীর বুননটা ধরার জন্য। কলকাতায় এক সদ্য-গ্র্যাজুয়েট, যে এখনো লুকিয়ে সিগারেট খায়, হাজারিবাগ বেড়াতে এসে উঠেছে মায়ের এক পাতানো মামার বাড়িতে। (লক্ষ্য করুন, সম্পর্কটা পাতানো। আসল মামা হলে গল্পের পরিণতিতে

ঝামেলা হতো, কারণ প্রতিভা বসুর যে একটি প্রিয় বিশ্বাস কি জীবনদর্শন আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি তা হলো প্রকৃত বিপরীতের সার্থক পরিণতিই হলো বিবাহের পিঁড়ি।) পাতানো দাদু-দিদিমার একমাত্র মেয়ে মারা গেছে, তাই তাঁদের জংলী ও ডানপিঠে চোদ্দ বছরের নাতনীটি তাঁদের নয়নের মণি। পাড়ার সমবয়সীদের সে একচ্ছত্র নেত্রী। সদ্য-গ্র্যাজুয়েট সুমন্তর সঙ্গে এই অম্বালিকার আলাপ করিয়ে দিলেন দাদু।

সুমন্ত একটু ভাব দেবে দেবে করছিল, অম্বু টানা চোখে, ভুরু কুঁচকে বিরূপ ভঙ্গিতে তেরচা করে তাকাল।

দাদু বললেন, কোথায় যাচ্ছিস? আয় তোর দাদা হয়—

দাদা, না হাতি! এক ঝাপটায় ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে সে চলে গেল দলবল নিয়ে।

দ্বিতীয়বার সুমন্ত ও অম্বুর দেখা হলো আমবাগানে। অম্বু বাগানে দরবার করছে গাছের ডালের সিংহাসনে বসে, তাই দেখে নতুন লাইটার বার করে সুমন্ত অনভ্যস্ত সিগারেট ধরিয়েছে।

"একটি নোয়ানো আমের ডালে বসে অম্বু চোখ-মুখ ঘুরিয়ে কী বিষয়ে যেন খুব বক্তৃতা দিচ্ছিল আর তার থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত একপাল ছেলেমেয়ে হাঁ করে গিলছিল। সুমন্ত মুখ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, লাইটার লুফতে লুফতে, এগিয়ে গিয়ে মুচকি হাসল। বয়স্ক ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, এই যে, কী হচ্ছে খুকি?

বক্তৃতা থামিয়ে চোদ্দ বছরের টুকটুকে খুকিটা ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখল, তারপব আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে একটা ছেলেকে হুকুম দিল, দ্যাখ তো পটলা, লোকটা কাকে খুকি খুকি করছে?

পটলা দেখবার আগেই সুমন্ত হাস্যবিস্তার করল, আমি তোমাকেই বলছি।

ও, আমাকে? গাল ভরে খুকিও হাসল, গলে গিয়ে বলল, কেন খোকা?"

তাদের তৃতীয় বাকযুদ্ধ মাঝরাত্রে। যাত্রা থেকে ফেরার মেঠো পথে অম্বুর ঘুম পেয়ে গিয়েছিল বলে গ্র্যাজুয়েট দাদা সাহস দেখিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চলেছে। কিন্তু চলনদার বীরপুরুষ স্বয়ং পথ চিনতে পারছে না, তাই হাজারিবাগের টমবয় আগে আগে দ্রুত হাঁটছে। জংলা পথে ভয় করছে গ্র্যাজুয়েটমশায়ের। তবু শহুরে পুং-অহংকার যায়নি।

"পথে আসতে আসতে সুমন্ত বলল, বাচ্চা মেয়ে, বাচ্চা মেয়ের মত থাকবে। বড়দের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে আবার যাত্রা দেখতে এসেছিলে কেন?

অম্বু বলল, তুমি এসেছিলে কেন?

আমি এসেছি দেখতে।

আমিও তাই।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, না? একটা চশমা পরে ঘুমুলে না কেন? আরও ভাল দেখতে পেতে।

তুমি কিনে দিও।

আমি কিনে দেব? আমার দায় পড়েছে। এমনিতেই তোমার যন্ত্রণায় মিছিমিছি কতখানি হাঁটতে হল...

সিগারেট খাও কেন, ঐটুকুন ছেলে?

কখন সিগারেট খেলাম?

সকালে খেলে না?

তুমি ভালবাস না সিগারেট খাওয়া?

না, সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়।

কে বলেছে?

দাদু।

দাদু কিছু জানেন না।

তুমি জান, পণ্ডিত!

কাল থেকে দেখিয়ে দেব কেমন পণ্ডিত, তোমার দিদিমা কী বলেছেন শুনেছ তো?

কী বলেছেন?

তুমি ভদ্রতা জান না, সভ্যতা জান না, তোমায় শিক্ষা দিতে বলেছেন।

আহারে!

আগে আগে যাচ্ছ কেন?

ঘোমটা দিয়ে তুমি পিছনে পিছনে আসবে বলে।

তাহলে দেখবে ঘোমটা দিয়ে কাকে পিছনে পিছনে আসতে হয়?

আচমকা এগিয়ে গিয়ে সে এক টানে কাছে নিয়ে এল অম্বুকে, শক্ত হাতে চেপে ধরে বলল, তুমি আমার সঙ্গে পারবে গায়ের জোরে? শূন্যে তুলে ছুড়ে ফেলে দেব ঐ বাঁশঝাড়টার মধ্যে। নিজের জায়গা পেয়েছে তাই। একবার যেও কলকাতায়, দেখিয়ে দেব তখন।

হাত ছাড়াবার চেষ্টায় অম্বু তাকে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে দিয়েছিল, তবু সে-ও ছাড়েনি। উনিশ বছরের তপ্ত বুকের মধ্যে চেপে ধরে রেখে বলেছিল, থাক দাঁড়িয়ে সারারাত, এই তোমার উচিত সাজা।

ছাড়।

ক্ষমা চাও।

না।

তাহলে আমিও ছাড়ব না।

বারে।

এখন তোমার চোর আসুক, ডাকাত আসুক, ঠাঙাড়ে আসুক, সারা হাজারিবাগের সব চ্যালাচামুণ্ডা আসুক, দেখে যাক তাদের অম্বুরানীর কী দশা আমার হাতে পড়ে।

অম্বু তখন তার নতুন টেরিলিনের শার্টটা বুকের কাছে ছিঁড়ে দিয়েছিল দাঁত দিয়ে।"

আর তার শাস্তিস্বরূপ সুমন্তও তার আলিঙ্গন দৃঢ়বদ্ধ করেছিল।

পরের দিন কিন্তু অম্বুর চোখে একটু লজ্জা দেখা গেল। সেই বোধহয় তার প্রথম লজ্জা। এবং সুমন্তরও বোধহয় সেটাই প্রথম প্রেম।

নইলে দু'সপ্তাহের জায়গায় ছ'সপ্তাহের সারা ছুটিটা হাজারিবাগে বসে বসে সে করল কী?

পাঠক, বর্তমান প্রাবন্ধিকের সাহস আছে, এটুকু নিশ্চয় মানবেন? নইলে নিরস সমালোচনার মধ্যে কেউ এরকম ঢলঢলে, হাসিখুশি আর ভালোবাসাভরা জলছবি ঢোকায়? এরপর প্রবন্ধট্রবন্ধ কোন বেরসিক পড়বে? এ সেই শ্রেষ্ঠ শিল্প—যাতে কোনো চিহ্নই নেই শিল্পের। ইংরেজি সাহিত্যের রেস্টোরেশন যুগের নাটকে সংলাপের খুব ধার তা যেন হীরের ছুরি। অস্কার ওয়াইল্ড কিংবা বার্নাড শ-এর সংলাপের খুবই চেকনাই, তাতে ভাষার জরির কল্কা-কাজ, শ্লেষ ও রঙ্গের মিনে ও জড়োয়া অলঙ্করণ। কিন্তু তা কৃত্রিম। ঐ ভাষায় বাস্তবে কেউ কথা বলে না। আর প্রতিভা বসুর সংলাপ? তা যেন চোরা টেপরেকর্ডারে তুলে তুলে পর পর লেখক বসিয়ে গেছেন মাত্র, তার একটি শব্দও কেউ যেন বানাতে পারে না। অথচ একটু গভীরে গেলেই বোঝা যাবে যে প্রথমে যত সরল ভাবা গিয়েছিল, এই রীতি তত সমতল নয়। হাসির তলায় আছে এক অতি সুসভ্য ও পুরুষ অপেক্ষা উন্নত প্রাণীর সংযত বিদ্রোহ। বুদ্ধির যুদ্ধে অম্বুই জয়ী। কথায় তার সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে না সুমন্ত, স্রেফ গায়ের জোরে অম্বুকে বশ করতে হয়।

'নারী স্বাধীনতা' নিয়ে এখন এত কথা হচ্ছে মার্কিনে-বিলেতে এবং তারই প্রতিধ্বনিতে, ভারতেও। কিন্তু তিন-চারের দশকে প্রতিভা বসু প্রায় এক হাতে—ঝাণ্ডা উড়িয়ে নয়, স্লোগান কপচে নয়—মধুর গল্পের পর গল্পের মধ্য দিয়ে নারীর সমকক্ষতা নয়, শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করেছেন। তাঁর সাহিত্যে, পুং শক্তির প্রাধান্য মানেই টাকার প্রাধান্য, সম্পত্তির প্রাধান্য। 'প্রথম সিঁড়ি' নামক সেই আশ্চর্য গল্পটিতে—যার শেষ পঙক্তিতে রেলগাড়ির চাকা বলতে থাকে "এ কিছু না এ কিছু না কত হবে কত যাবে কত হবে কত যাবে"—কিশোর প্রেম অছিলা মাত্র। আসলে গল্পটির বিষয় পণপ্রথা, কুলীনপ্রথা, কৌতুকের ছদ্মবেশে লোভী মামার অপরকে ব্যথা দিয়ে আনন্দ পাওয়ার প্রবণতা। যাকে আজকাল বলা হয়, 'প্রতিবাদী কণ্ঠ', প্রতিভা বসুর কণ্ঠও তাই, কিন্তু তা উগ্র প্রতিবাদে ফাটা কি ভাঙা নয়, তা সুরেলা, তাতে আছে কৌতুক ও সঙ্গীত। এই বি জে পি প্রাধান্যের যুগে, যে কোনোদিন প্রতিভা বসুর 'সুমিত্রার অপমৃত্যু' কিংবা 'সমুদ্র হৃদয়' উপন্যাস বাজেয়াপ্তের দাবি উঠতে পারে, কারণ এই লেখকের ধর্ম বলতে, বিশ্বাস বলতে, একটাই, আর তা হলো প্রেম। 'ঘাসমাটি' গল্পের সমাপ্তি মনে আছে?

"ইউসুফ, ভালবাসা সত্যিই ঘাসের মত, সে থাকে, চিরদিন থাকে, সঁপে দিয়েও সামান্য জলের ছোঁয়ায় আবার তেমনি সবুজ হয়ে বেঁচে ওঠে। এই মুহূর্তে আমি এই সত্যই উপলব্ধি করে সানন্দ বিস্ময়ে তোমাকে জানাই, আত্মা আমাদের কল্পনার অনুভব, কিন্তু যা আমাদের অনুভূতির অন্তর্গত তা হচ্ছে আমাদের প্রেম, যে প্রেম কখনও কোনও সময়ের সীমায় গণ্ডিবদ্ধ থাকে না, সব বয়সেই যা সমান রোমাঞ্চ এনে দেয় জীবনে। আমি দুঃখ পেয়েছি কিন্তু বেঁচে থাকার অর্থটাও খুঁজে পেলাম

এতদিনে। বল, এখন আমি কী করব।”

মনে আছে তো, যে প্রেমের এই জয়ধ্বনি করছেন বর্ষীয়ান প্রাক্তন স্বদেশী নেত্রী মাধবী মিত্র ঢাকার নবাব বংশীয় একটি প্রাক্তন আই সি এসের উদ্দেশে? ইউসুফ মাধবীকে ভালোবাসে—এটা জেনেও যে একজন ভাগবদ্‌গীতা কপচানো হিন্দু উগ্রপন্থীর প্ররোচনায় মাধবী তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ যুদ্ধের কত আগে থেকে ঢাকার রাণু সোম হিন্দু-মুসলমান ‘সমস্যার’ সমাধান হিসেবে ভালোবাসার জয়গান করেছেন। তাঁর মতো বিপ্লবী কে? কিন্তু যেহেতু সামাজিক সমস্যাকে তিনি গল্পের সুন্দর ত্বক ভেদ করে লাল ফোঁড়ার মতো দগদগে হতে দেন না, যেহেতু ‘ব্লু ফ্লিম’-এর মতো উগ্রভাবে প্রকাশ করে না দৈহিক কামনা।

তাকে “অম্বু তখন তার নতুন টেরিলিনের শার্টটা বুকের কাছে ছিঁড়ে দিয়েছিল দাঁত দিয়ে” ধরনের সঙ্কেতে ছিলাবদ্ধ রাখেন, অসতর্ক পাঠক প্রতিভা বসুকে ‘শুধুই উপভোগ্য’ বলে ঘাড় ঝাঁকাতে পারেন। অনেকেই ভুলে যান যে অগভীর পাহাড়ী ঝর্নাই সশব্দ ও সফেন তরঙ্গময়—গভীর গঙ্গা কিংবা যমুনা নীরব ও মসৃণপ্রবাহী। তাঁর সৃষ্টির বাহ্যিক সরলতা ও সরসতাই হয়তো কারণ যে ৭৫ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও প্রতিভা বসু কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাননি। অকাদেমি-টেমি তাঁর বরাতে নেই। তাঁর পুরস্কার নজরুল ইসলাম—দিলীপ রায়—সত্যেন বসু থেকে শুরু করে অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, নরেশ গুহ, অরুণ সরকারের ভালোবাসা। কে না প্রার্থনা করেছে: ‘ও দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের পাব কি পরশ যৎসামান্য।’ আমরা নিজের চোখের রং জানি না, কিন্তু প্রতিভা বসুর চোখের মণির রং চিতাবাঘের ছোপের মতো কালোর মধ্যে পিঙ্গল।

লুকোনো, চতুর এক কবিকে চেনা

ট্রামের ধাক্কার ফলে জীবনানন্দের যখন মৃত্যু হলো, তৎকালের সেই ক্ষীণ সংখ্যক পাঠকের কাছে, যাঁরা তখন আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে খবর রাখতেন, তাঁদের কাছে তিনি ছিলেন বাংলা কবিতার পাঁচ প্রধান আধুনিক কবির একজন মাত্র। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে 'আধুনিক'-ও নন, যে অর্থে বিষ্ণু দে ছিলেন 'আধুনিক', সবচেয়ে বিদগ্ধও নন, যেমন 'সংবর্ত'-র কবি সুধীন্দ্রনাথ, সবচয়ে আবেগমথিত কি রোমাণ্টিকও নন বুদ্ধদেব বসুর মতো। তাঁর কবিতার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, তাঁরা তাঁকে উপভোগ করতেন তাঁর চিত্রকল্পের জন্য, তাঁর ইন্দ্রিয়ময়তার জন্য, কিন্তু জীবনানন্দর শিল্প কি মনীষা বিষয়ে বিশেষ শ্রদ্ধা কারো ছিলো না। 'কবিতা' পত্রিকায় জীবনানন্দর পাণ্ডুলিপিতে এন্তার কাটাকুটি দেখে সুধীন্দ্রনাথ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। সুধীন্দ্রর ধারণা ছিল যে জীবনানন্দ স্বভাবকবি, এবং তাঁর রচনার পশ্চাতে আছে সাধনা নয়, প্রেরণা। সংস্কৃতি নয়, প্রকৃতি। এমন কি তাঁর মুখ্য প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা বুদ্ধদেব বসু তাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন 'নির্জনতম' কবিরূপে, যেন তিনি সভ্যতার বাইরের, তিনি সত্যই কেবল লাশকাটা ঘরের আর ধানসিড়ি নদীর জগতের, এবং তিনি বাস্তবিকই এক নির্জন নির্ঝর, যে একা-একা ঘুরে-ঘুরে জলের মতো কথা কয়।

তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী সাড়ে চার দশকে, একের পর এক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হয়ে ছবিটা সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। নিজের যে প্রতিকৃতিটা জীবনানন্দ তাঁব সমসাময়িকদের দেখতে দিয়েছিলেন তা অনেকটা অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের বেড়ালের হাসির মতো : শরীরের বাকিটা অদৃশ্য হয়ে গেছে, শূন্যে ভাসছে শুধু হাসি। পাণ্ডুলিপিগুলি থেকে আমরা এই অত্যন্ত জীবন্ত, ল্যাজ-থেকে-গোঁফ পর্যন্ত অনুভূতিময় শুধু নয়, অত্যন্ত বুদ্ধিমান বেড়ালের বাকিটা পুনরুদ্ধার করতে পারছি। আমার জানা অপর কোনো প্রধান বাঙালী লেখক নেই যিনি পরবর্তী খননকারীদের জন্য এমন উঁচু এক পাণ্ডুলিপির মহেঞ্জোদারো ফেলে রেখে গেছেন। 'বনলতা সেন' কি 'সিন্ধুসারস' হচ্ছে একটি দীর্ঘ ও জটিল ঘাতপ্রতিঘাতময় প্রক্রিয়ার ফসল,— যার অন্তর্বর্তী পর্যায়গুলি জীবনানন্দ গোপন রেখেছিলেন। তাঁর সমসাময়িকেরা তাঁকে একজন আপনভোলা, সরল, চকিত, ভালোমানুষ বলে মেনে নিয়েছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে তিনি অত্যন্ত সচেতন শিল্পী, ডিটেকটিভ গল্পের শেষে যেমন দেখা যায় যে সবচেয়ে গোবেচারা ও বোকাসোকা চবিত্রটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান, তেমন

'মাল্যবান' কি 'জলপাইহাটি' ফাঁস করে দিয়েছে যে এই লোকটি আসলে খুবই সেয়ানা। কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজকে সে হাড়ে-হাড়ে চেনে। কবির উপন্যাস সাধারণত যেমন হয়, জীবনানন্দর উপন্যাস সেরকম নয়। পোল ভালেরির মসিয়ঁ তেস্ত কিংবা বুদ্ধদেব বসুর মৌলিনাথ নয় মাল্যবান কি নিশীথ সেন। স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমিকের প্রণয়ালাপ যেমন ঘুমের ভান করে মাল্যবান শুনে যায়, তেমন দেশভাগ-পরবর্তী কলকাতার শূন্যতা ও ভয়াবহতা কখনো-কখনো কবিতায় সাংকেতিকভাবে প্রকাশ করলেও তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মতো কাঁচা বাংলা গদ্যে লেখা বিরুদ্ধ ও সর্বনাশা রায় টের পেতে দেননি। 'মহাপৃথিবী'র 'শহর' কবিতায় পড়ি :

হৃদয়, অনেক বড়ো-বড়ো শহর দেখেছো তুমি ;
সেই সব শহরের ইঁটপাথর,
কথা, কাজ, আশা, নিরাশার ভয়াবহ হৃত চক্ষু
আমার মনের বিস্বাদের মধ্যে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।

আমরা ভাবি, গ্রাম-বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কবি বেচারা তাঁর স্বাভাবিক চিত্রময়তা হারিয়ে ফেলেছেন। সমালোচকেরা অভিযোগ করেন যে তিনি কেন হিজল-চালতা-ধানের গন্ধের কথা আর লিখছেন না! এমনকি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কি বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত এই পরম প্রবঞ্চক শিল্পীর ছদ্মবেশকেই আসল বলে গ্রহণ করেছেন। পাণ্ডুলিপিতে কয়েকটি শব্দের কাটাকুটি দেখে সুধীন্দ্র বিস্মিত? তিনি যদি 'রূপসী বাংলা'র অস্তিত্ব বিষয়ে অবহিত হতেন! দু-চারটে শব্দ কি একটি-দুটি পঙ্ক্তি কি স্টাঞ্জা নয়, ষাটের অধিক সনেট ও সনেটের ন্যায় কবিতার পুরো একটা চক্র জীবনানন্দ বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন,— এতই নিজের শিল্প বিষয়ে সচেতন এবং প্রকাশন বিষয়ে সংযমী ছিলেন এই প্রখর আত্মসমালোচক কবি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এরকম একটা রহস্য দ্বিতীয় নেই। কেন জীবনানন্দ এই সনেটচক্রের কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দেননি। তাঁর তোরঙ্গে দুয়েকটি উপন্যাস প্রকাশের অপেক্ষায় যে থাকলেও থাকতে পারে, এমন ইঙ্গিত তবু সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠিতে আমরা পাই। (অবশ্য, ইঙ্গিতই শুধু, শেষ পর্যন্ত তোরঙ্গ থেকে ওইগুলি তিনি বার করেননি।) কিন্তু অশোকানন্দ যাকে 'রূপসী বাংলা' নামে ১৯৫৭ সালে প্রকাশ করে আমাদের জীবনানন্দ-চেতনার দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা উত্তোলন করলেন, সেটা একটা প্রধান সৃষ্টি যা শুধু জীবনানন্দর পরবর্তী রচনার অর্থ উদ্ধারের চাবি, তাই নয়, যা নিজস্ব বৈভবেও অনন্য ধনী, নানাবিধ ঐশ্বর্যে ঠাসা। জীবনানন্দর যে ৪০টি কবিতার খাতা কলকাতার ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত, তা নিশ্চয় অনেক পি এইচ ডি ডিসার্টেশনের জনক হবে। আমার বিশ্বাস, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করবে 'রূপসী বাংলা'-র খাতা। এটাই হলো

জীবনানন্দ-দর্শনের হরপ্পা লিপির রসেটা স্টোন। এটা আবিষ্কারের পর, জীবনানন্দর প্রতীকী ভাষা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

'রূপসী বাংলা'-কে 'রসেটা স্টোন' কেন বলছি, তার একটু ব্যাখ্যা দরকার। জীবনানন্দর কবিতায় আরো অনেক টুকরো-টুকরো সূত্র ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বলে আমরা সহজে তার পাঠোদ্ধার করতে পারি না। যেমন হরপ্পা লিপি আমরা ভেদ করতে পারিনি, কারণ সেগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন। পুরো একটি কাহিনী তো দূরের কথা, আস্ত বাক্যও পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য-কিছুর সঙ্গে পাশাপাশি রেখে অর্থের অনুবাদ কি শব্দের উচ্চারণ অনুমান তো দূরের কথা। 'রূপসী বাংলা'য় কিন্তু আমরা পাশাপাশি ষাটটির মতো সনেটের আকারে সমান্তর সূত্র পাচ্ছি, যা 'রসেটা শিলা'-র মতো। ১৭৯৯ সালে মিশরে আবিষ্কৃত ওই পাথরে তিনটি ভাষায়—প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপি, ওই চিত্রলিপির এক প্রকারভেদ, এবং প্রাচীন গ্রিক—সমান্তরাল ছকে খোদাই করা ছিল, যার একটির সঙ্গে অন্যটা মিলিয়ে পণ্ডিতেরা উদ্ধার করেছিলেন যে এটি পঞ্চম টলেমি এপিফানিস-এর সাম্রাজ্যকালে (খ্রিঃ পূঃ ২০৫-১৮০) রচিত, তা এক মন্দিরের পুরোহিতদের লেখা সম্রাটের দানের ফিরিস্তি। শিলালিপিতে পাখি ও পশুদের মাথা কোন দিকে, তা থেকে ইংলণ্ডের টমাস ইয়াঙ এবং ফ্রান্সের জাঁ ফ্রাঁসোয়া শাপলিয়ঁ সাহর করেছিলেন যে, বাক্যগুলির আদ্যন্ত কোথায়। আমরাও তেমন অধুনা-আবিষ্কৃত 'রূপসী বাংলা'-র কবিতার উপর জীবনানন্দর পূর্বজ্ঞাত কবিতা ফেলে অনেক গুহ্যার্থ ভেদ করতে পারি।

স্রেফ 'ইন্দ্রিয়নির্ভর' একজন মনোহীন কবি নন জীবনানন্দ। বরং তাঁরই ছিল নিজস্ব এক সামগ্রিক দর্শন, যার তুলনায় সুধীন্দ্রর নিহিলিজম কিংবা বিষ্ণু দে-র মার্কসবাদ বড়ই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ও সিমপ্লিস্টিক। একেকটি সভ্যতার উত্থান ও পতন, এই তরঙ্গের পর তরঙ্গের প্রবাহের লক্ষ্য, এবং এর মধ্যে মানবের অবস্থান বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি স্বকীয়, তা কোনো দার্শনিক কি ঐতিহাসিকের বই থেকে আহৃত নয়, যাতে উপলব্ধির প্রাবল্যে ভাবনা ও ছবি এক হয়ে গেছে। তাঁর বইগুলির নামই সাংকেতিক। 'সাতটি তারার তিমির', কি 'মহাপৃথিবী'-র চেয়ে আরো স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে নাকি কবিকে? কিন্তু ওই নক্ষত্র, ওই শাশ্বত সূর্য, ওই সিন্ধুসারস থেকে শুরু করে ধানসিড়ি ও চিলাই নদী, হিজল ও ক্ষীরুই, বাসক, নোনা, নাটাফল, সাপমাসী পোকা— মহাজাগতিক থেকে আণুবীক্ষণিক বিশাল পট সমকালীন কবিদের বোধগম্যতার অতীত ছিল। তিনি তাঁর ধরণে খুব প্রাঞ্জল করেই তাঁর 'দর্শন' প্রকাশ করেছেন,—কখনো ভিজে, দ্রব, ঘন ছবিতে, যেমন :

> যেখানে রুপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে সমের ভিতর,
> যেখানে অনেক মশা বানায়েছে তাহাদের ঘর,
> যেখানে সোনালি মাছ খুঁটে-খুঁটে খায়

সেইসব নীল মশা মৌন আকাঙ্ক্ষায়
এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন, নীল লাল রুপালি নীরব।

অথবা কখনো প্রায় সংবাদপত্রের শিরোনামের মতো ঘোষণায়। যেমন, যে-কবিতায় তিনি তাঁর 'বিস্বাদ' ও আশাবাদ দুই-ই তাঁর নিজস্ব প্রতীকী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন (পাঠক, পুনরাবৃত্তি ক্ষমা করবেন) :

হৃদয়, অনেক বড়ো-বড়ো শহর দেখেছো তুমি;
সেইসব শহরের ইটপাথর,
কথা, কাজ, আশা, নিরাশার ভয়াবহ হৃত চক্ষু
আমার মনের বিস্বাদের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
কিন্তু তবুও শহরের বিপুল মেঘের কিনারে সূর্য উঠতে দেখেছি;
বন্দরের ওপারে সূর্যকে দেখেছি
মেঘের কমলারঙের খেতের ভিতর প্রণয়ী
চাষার মতো বোঝা রয়েছে তার;
শহরের গ্যাসের আলো ও উঁচু-উঁচু মিনারের
উপরেও দেখেছি—নক্ষত্রেরা—
অজস্র বুনো হাঁসের মতো কোন দক্ষিণ সমুদ্রের
দিকে উড়ে চলেছে।

"যেখানে রূপালি জ্যোৎস্না" এবং "হৃদয়, অনেক বড়ো-বড়ো শহর" দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। একটিতে কবির দৃষ্টি মাছ-মশা-সরের লেভেলের। অন্যটিতে কবির বীক্ষণ মহাজাগতিক, এমনকি "শহরের গ্যাসের আলো ও উঁচু-উঁচু মিনারের"-ও উর্ধ্বে। একটি মনে হতে পারে শুধুই ছবি, যার কোনো বার্তা নেই। অন্যটিতে বার্তাই প্রধান, কবিতা নেই। 'মহাপৃথিবী' র পাতায় এ দুটি কবিতা পাশাপাশি—পাঠক যদি বিভ্রান্ত হন, বিস্ময় কী? এই দুই মেরুকে যুক্ত করে যে গোপন ভাষা, সেই প্রতীক নির্মাণের অধ্যায় এখন অনুসন্ধান করা দরকার।

উপরের অংশটি দ্বিতীয়বার পড়ে মনে হলো আমি যেন দার্শনিক জীবনানন্দকে প্রাধান্য দিচ্ছি, কবি জীবনানন্দকে উপেক্ষা করে। কিন্তু তা কি চেষ্টা করেও সম্ভব? একদিন যা লোকেদের হাস্যকর কি অর্থহীন মনে হতো, ক্রমপরিচয়ের ফলে তাই পরবর্তীকালে স্বীকৃত হয়েছে বিশুদ্ধ কবিতার নিরিখ হিসেবে। গ্রাম্য ও বিদেশী শব্দের ব্যবহার আগে ছিল 'শনিবারের চিঠি'র উপহাসের খোরাক, এখন সেইসব ব্যবহারই মনে হয় প্রকৃত কবিতা, বাকি সব কাব্যিক :

মরখুটে ঘোড়া ঐ ঘাস খায়, -ঘাড়ে তার ঘায়ের উপরে
বিনবিনে ডাঁশগুলো শিশিরের মতো শব্দ করে।

কিংবা

একটি পাখির মতো ডিনামাইটের পরে ব'সে

কিংবা

বিস্তৃত প্রাসাদে তারা দেয়ালের অবলঙ ছবি...

এবং এমন ইঙ্গিত যদি দিয়ে থাকি যে তিনি সাহিত্যে কারো কাছে ঋণী নন, অযোনিসম্ভূত, তা হলেও যে সত্যের অপলাপ হয় তা বাংলা সাহিত্যের ছাত্র মাত্রেই জানেন। নজরুলের প্রভাব আছে তাঁর কবিতায়, ইয়েটস-এর কয়েকটি কবিতার স্বাধীন অনুবাদ/রূপান্তর করেছেন জীবনানন্দ, এবং শেক্সপীয়ার-এর একটি বিখ্যাত বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয়:

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সবচেয়ে সুন্দর, করুণ,
যেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল...

জীবনানন্দ যা করেছিলেন তা অনুবাদ নয়, তা বাংলাব শরীরে—স্বাধীন আত্তীকরণ। আইরিশ কবি ডাব্লিউ বি ইয়েটস-এর সংলাপ-কবিতা 'অনুসূয়া-বিজয়' জীবনানন্দে পুনর্জন্ম নেয় 'বনলতা সেন'-এর 'দুজন' কবিতায়। কবিতা দুটিই দীর্ঘ, নইলে পাঠকদের আবার পড়াবার লোভ সামলাতে পারতুম না। ইয়েটসের 'দ্য উইণ্ড অ্যামঙ দ্য রিডস' মাত্র ছয় লাইন। ওই ছয়কে জীবনানন্দ করেছিলেন সাত লাইনের মৌলিক বাংলা কবিতা, যাতে অনুবাদজনিত আড়ষ্টতার চিহ্নমাত্র নেই—"হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে..."

The Wind among the Reeds

O Curlew, cry no more in the air,
Or only to the water in the West ;
Because your crying brings to my mind
Passion-dimmed eyes and long heavy hair
That was shaken out over my breast :
There is enough evil in the crying of the wind.

একে চুরি বলে না, একে বলে কিমিয়া। ইয়েটস স্বয়ং এরকম কুম্ভীলকবৃত্তি ঢের করেছেন, যেমন রসাঁর থেকে তাঁর 'হোয়েন ইউ আর ওল্ড' প্রতিভাময় চুরি।

When you are old and grey, and full of sleep
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and then shadows deep...

বাংলার নিজস্ব মধুকূপী ঘাস দিয়ে জীবনানন্দ ঢেকে দিয়েছেন শেক্সপীয়ারের 'দ্য মিডসামার নাইটস ড্রিম'-এর এই অংশ :

I know a bank whereon the wild thyme blows,
Where oxlips and the nodding violet grows
Quite overcanopied luscious woodbine,
With sweet musk-roses and with eglantine...

'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'— উক্তিটির কারণে এইরকম যদি ধারণা হয় যে জীবনানন্দ স্বভাবকবি, তিনি নিজেকে এই শিল্পে প্রভূত শ্রমে শিক্ষিত করেননি, তা যে ভুল হবে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে জমা-দেয়া ওই সার-সার চল্লিশটি খাতাই তো তার প্রমাণ। এখানে আমি শুধু 'রূপসী বাংলা'-র আলোচনা করব। এই কবিতামালা একদিকে যেমন একটা প্রাকৃতিক উদ্‌গরণ, তেমন আবার কবিতা লেখার ব্যায়াম, একটা প্রশিক্ষণ পদ্ধতির চর্চা, সনেট রচনা প্রণালীর অনুসরণ। কখনো মনে হয় যেন পেনসিলের সিস কাটারও তর সইছিল না কবির, এমন জ্বরের ঘোরের মতো আবেশে কবিতাগুলি লেখা। আবার কখনো মনে হয় কোনো প্রকৃত প্রেরণা নেই, একই কথার পুনরাবৃত্তি করছেন কবি, শুধু ফর্মাটা মকশো করার জন্যই কখখক কখখক গঘগঘগঘ মিলের অন্বয়ে সনেটের পর সনেটে খাতা ভরিয়ে চলেছেন। কখনো কখনো মিলের জন্য তিনি এমন সব কাব্যিক শব্দ ব্যবহার করেন যা রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী কবিতায় অচল—চঞ্চল আঙুল/শরীরের ধূল (ধুলো অর্থে!)। কিংবা গুরুচণ্ডাল—শাদা ভাঁটপুষ্পের তোড়া। কোনো কোনো সনেটের শেষ পঙক্তির সঙ্গে মিল হচ্ছে পরেরটির প্রথম চরণের, যথা ৩১-৩২-৩৩-৩৪তম কবিতার। অন্যত্র একই পঙক্তি দিয়ে শুরু পর পর দুইটি সনেট। যেমন ১১নং ও ১২নং সনেট। উভয়েই শুরু হচ্ছে এই পঙক্তি দিয়ে "ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে"।

দুই-ই সত্য, 'রূপসী বাংলা' একই সঙ্গে একটি জলোচ্ছ্বাস, একটি ঘূর্ণী, জ্বরের বিকার, মৃত্যুর জন্য প্রবল আকূতি—আবার একটি সাহিত্যিক টুর দ্য ফোর্স। এবং কবিরা কী করে বাস্তবের গ্লানিকে পরিণত করেন কবিতার বিজয়ে, তারও একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 'রূপসী বাংলা'। রচনাকাল সম্ভবত ১৯৩৩। জীবনানন্দ বিয়ে করে নতুন সংসার পেতেছেন বরিশালে তাঁদের পৈতৃক বাড়িতে। দিল্লির রামযশ কলেজে বিয়ে করার জন্য ছুটি চেয়েছিলেন, মঞ্জুর হয়নি। তিন বছর হলো বেকার, এবং কবিতা প্রকাশেরও খুব বেশি দরজা খোলা নেই। 'প্রগতি' ও 'কল্লোল' বন্ধ হয়ে গেছে। 'কবিতা' প্রকাশ হতে আরো দু বছর বাকি। বাইরের লোকের চোখে বরিশালে বসে বসে তিনি পচছেন। আর তাঁর নিজের ভাষ্য হচ্ছে:

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে

ভোরের দোয়েল পাখি

কোথাও দেখিনি, আহা, এমন বিজন ঘাস—প্রান্তরের পারে
নরম বিমর্ষ চোখ চেয়ে আছে—নীল বুকে আছে তাহাদের
গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা ঢের,
হিজলের ক্লান্ত পাতা...

পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কোনখানে সফলতা শক্তির ভিতর,
কোনখানে আকাশের গায়ে রূঢ় মনুমেন্ট উঠিতেছে জেগে,
কোথায় মাস্তুল তুলে জাহাজের ভিড় সব লেগে আছে মেঘে,
জানি নাকো ; আমি এই বাংলার পাড়াগাঁয়ে বাঁধিয়াছি ঘর ;
সন্ধ্যায় যে দাঁড়কাক উড়ে যায় তালবনে—মুখে দুটো খড়
নিয়ে যায়—সকালে যে নিমপাখি উড়ে আসে কাতর আবেগে
নীল তেঁতুলের বনে—তেমনি করুণা এক বুকে আছে লেগে ;
বঁইচির বনে আমি জোনাকির রূপ দেখে হয়েছি কাতর ; ...

ভাগ্যিস, চাকরির ডাক আসেনি তাঁর রামযশ থেকে। বাংলার মফস্বলে অন্তরীণ এই ইংরেজীর অধ্যাপক আবিষ্কার করলেন এমন এক ফ্লোরা ও ফণা যা ইতিপূর্বে সাহিত্যে ছিল উপেক্ষিত। এমন এক জগৎকে তিনি কবিতায় ধরলেন, যেখান থেকে তাঁর নির্বাসনের আদেশ হয়ে গেছে। 'রূপসী বাংলা'-র একটা প্রাধন আবেদন এই যে, অন্তত বর্ণহিন্দুর কাছে, এটা একটা প্যারাডাইস লস্ট। বীরভূমে-বর্ধমানে কেউ এই জল-বিল-নালার জীবনযাত্রা চিনবে না :

রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর, এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়...
ঝাঝরা ফোঁপরা আহা ডিঙিটিরে বেঁধে রেখে গেছে
হিজলে...

কিন্তু শুধু দেশভাগ নয়, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে সারা পৃথিবীই দ্রুত পরিবর্তমান। যে 'রূপসী বাংলা'-র দ্বারা কবি অধিকৃত, তা অজান্তে হয়ে যাচ্ছিল ইতিহাস। কবির বাংলা হচ্ছে অনুভূতির বাংলা। তা হচ্ছে কবির কাছে যা এখন, যা এখানে, যা উপস্থিত ; এর উল্টোটা হলো যা অসীম, যা অপর, যা অনুভূতির বাইরে, যা ব্যক্তিকে বিক্ষত করে, ক্লান্ত করে। বাংলা-র যে স্তুতি করেন কবি তা মোটেই জিঙ্গোইস্ট নয়, তা ক্ষমতার উপাসনা কি আগ্রাসনের সমর্থন নয়। তাতে চেষ্টা নেই কোনো মনুমেন্ট গড়ার। ব্যাবিলন গেছে, বিদিশা, শ্রাবস্তি গেছে, সভ্যতার পর সভ্যতা লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু কবির প্রাপ্তি হলো তাঁর 'এখন'-কে নিয়ে 'উপস্থিত'-কে নিয়ে 'এই এখানে'-কে নিয়ে মুগ্ধতা। একটি সনেটে তিনি দূর বলে যেসব স্থানের নাম করছেন,—এবং যেখানে যাবেন না বলে তাঁর প্রতিজ্ঞা—সে-সব ফিরিস্তি পরবর্তী রাজনৈতিক কারণে

কিঞ্চিৎ কৌতুককর ঠেকে।

এই ডাঙা ছেড়ে হায় রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে
বটের শুকনো পাতা যেন এক যুগান্তের গল্প ডেকে আনে:
ছড়ায়ে র'য়েছে তারা প্রান্তরের পথে-পথে নির্জনে অঘ্রাণে ;—
তাদের উপেক্ষা ক'রে কে যাবে বিদেশে বল— আমি কোনো-মতে
বাসমতী ধানক্ষেত ছেড়ে দিয়ে মালাবারে— উটির পর্বতে
যাব নাকো ;—দেখিব না পামগাছ মাথা নাড়ে সমুদ্রের গানে
কোন্ দেশে,—কোথায় এলাচিফুল দারুচিনি বারুণীর প্রাণে
বিনুনি খসায়ে ব'সে থাকিবার স্বপ্ন আনে ;— পৃথিবীর পথে
যাবো নাকো...

কবিকে এই খোঁচা দেয়া খুব সহজ, যে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ভেঙে পশ্চিমে গিয়েছিলেন। ইতিহাসের এমনই খামখেয়াল যে একদিন মালাবার আর উটিই হবে তাঁর 'স্বদেশ', এবং তাঁর হিজল-ক্ষীরুই-এর। বাংলা, বাবলা-হোগলা-কাশ ছাওয়া খাল-বিলের বাংলা হবে 'বিদেশ'। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে জীবনানন্দ—তাঁর আশ্চর্য 'সিন্ধুসারস' সত্ত্বেও—কক্ষনো হবেন না ভারতবর্ষের কবি। তিনি 'রূপসী বাংলা'র আর 'মহাপৃথিবী'র কবি। এমনকি মহাজাগতিক কবি। আমার যদি যথেষ্ট সময় —ও পাণ্ডিত্য—থাকত তবে আমি জীবনানন্দ-সাহিত্যের একটা সুবৃহৎ কনকর্ডান্স সংগ্রহ করতাম যাতে কবিতা থেকে চিঠি থেকে গল্পের ক্রসরেফারেন্স থাকবে, পাঠক সঙ্গে-সঙ্গে দেখে নিতে পারবেন একেকটি উপমা ও চিত্রকল্পের রূপান্তর। কিন্তু এত কাণ্ড ছাড়াই পাঠক কী উপরের সনেটে দেখতে পারছেন না 'বনলতা সেন'-এর বীজ ?

কনকর্ডান্স না হোক, একটা গ্লসারি তো জড়ো করা যেতেই পারে। যাঁরা জীবনানন্দকে শুধু ইন্দ্রিয়রম্য ভাবেন, জীবনানন্দ-ব্যবহৃত প্রতীকী শব্দের একটা অভিধান তাঁদের খুব কাজে লাগবে নিশ্চয়। নক্ষত্র, ধূসর, নীল, বেবিলন, হরিণ, চিতাবাঘ, ঘাস, অরুণিমা সান্যাল, বনলতা সেন, ধানসিড়ি, কীর্তিনাশা, মহিলা... এইসব শব্দের দ্যোতনা তখন তাঁরা বুঝতে পারবেন। কিন্তু, কী হবে ? কবিতা তো ইকনমিক্স নয়, যে তা গজাল মেরে বোঝানো যাবে। বড় বড় ইনটেলেকচুয়ালদের প্রসঙ্গ টেনে বলা যায় যে ইতিহাসের চক্রতত্ত্বের উপর আর একটা ঘনত্ব যোগ করেছেন জীবনানন্দ। খ্রিস্ট ও বৌদ্ধ চেতনার দগ্ধভালে লেপেছেন এক বাংলার নারীর চন্দনপ্রলেপ। দক্ষিণ আমেরিকার মনস্বী লেখক বর্হেস বারবার উদ্ধৃতি দেন ফরাসি গাণিতিক-দার্শনিক পাস্কালের: 'আমি মহাশূন্যের সেইসব সুদূর প্রদেশের কথা ভাবি যার কথা আমি কিছুই জানি না ; এবং আমার বিভীষিকা সেই সব বিস্তৃত প্রদেশ যেখানে আমি অজ্ঞাত।' জীবনানন্দ সেইসব শূন্যতম ও সুদূরতম ঘুরে এসেছিলেন। এবং তার রিপোর্ট: সেইসব ইন্টারস্টেলার স্পেসেও অরুণিমা

সন্যালদের শব ভাসে। গ্লসারি লিখে কী হবে? তিনি নিজেই তো কতবার, কতভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রথম অনেকটা প্রেমের মতো, প্রথম দেখায় হিট করল তো করল।

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে;
বড়ো বড়ো নগরীর বুকভরা ব্যথা;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সঙ্কল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।
তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো:
এখনো নারীর মানে তুমি, কতো রাধিকা ফুরালো।

এই সময়ের ক্ল্যাসিক

নতুন সহস্রাব্দের সিংহদ্বারে কী উজ্জ্বল এক মশাল হাতে করেই না আমরা পৌঁছলাম : জানি না, বিংশ শতক এই স্টাইলে শেষ করার সৌভাগ্য আর কোনো জাতির হয়েছে কিনা— একটি মহাকাব্য দিয়ে। আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ত্রয়ীর— 'সেই সময়' 'প্রথম আলো' এবং 'পূর্ব-পশ্চিম'-এর কথা বলছি। প্রকৃতির মতো সহজ, পক্ষপাতহীন, সর্বসাধারণের বোধগম্য, সঠিক অর্থে 'ক্ল্যাসিকাল' একটি মহান কাজ করে উঠেছেন সুনীল। এরপর তিনি তাঁর সমকালীন সব কবি-লেখকদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেন। এখন থেকে তিনি বিংশ শতাব্দীর শুধু নয়, বিশ্বসাহিত্যের সব যুগের অমরদের একজন।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য যে আবার এমন একটা প্রায় বিধাতার মতো সর্বজ্ঞ, ইডিওলজির ধোঁয়া আর রাগের ফুলকিহীন লেখকের আবির্ভাব যে হবে, এমন তো কথা ছিল না। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে, পশ্চিমের অনুকরণে, দুর্বোধ্যতা, কূটতা, অবসাদ, ক্লিষ্টতা, রোগ এবং নৈরাশ্যকেই আমরা ভেবেছিলাম সাহিত্যে আধুনিকতা।

আমাদের প্রজন্মের যে-লেখক সুনীলের অপর মেরুর, কলা-কৈবল্যের যিনি প্রধান প্রবক্তা, সেই সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য কোনো বোধ কি বহির্জগৎ-বিষয়ক কোনো অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন নেই, শুধু ভাষার যাদু কি কৌশলই সব।

এই শূন্যবাদের ফলে, আমরা আরাধনা করেছি কাদের? এলিয়ট, ভালেরি, মালার্মে, ফ্রবেয়ার, জয়েস, বেকেট, ডাডা-নিকানর পারা— কাকে না? সত্যই আমরা বিদেশের কুকুর ধরেছি স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া!

এর অর্থ এই নয় যে সভ্যতার ইতিহাসে ইওরোপের অবদানকে আমি খাটো করছি। এক কৃষিনির্ভর এবং পাদরি-মোল্লা-পুরুষ-ম্যাণ্ডারিনশাসিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভীরু গোষ্ঠীর গণ্ডিবদ্ধ মানব নামক অর্ধ-জন্তুকে টেলিফোন, টিভি, সিনেমা, পেনিসিলিন, মোটরগাড়ি, ট্রেন, প্লেন, বাইপাস সার্জারি, স্ক্যান, ইন্টারনেটই শুধু দেয়নি পশ্চিম, দিয়েছে আমাদের সবচেয়ে বড় ধন— ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বিজ্ঞান।

এবং ইউরোপের সাহিত্যে এতকিছু ঘটে গেছে, সেখানে এত স্বচ্ছতা ও আলোক, এনলাইটেনমেণ্টের রবিকর সেখানে এতই প্রখর, যে বিশ শতকের ইওরোপের লেখকদের পক্ষে স্বাভাবিক— নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে—নানান অন্ধকার গর্ত খোঁজা। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসটাই চিন্তা করুন। কী আধুনিক

মনস্তত্ত্ব, বাস্তবতা ও সহানুভূতি মধ্যযুগের শেষাশেষি জিওফ্রে চসারের ৬০০ বছরের পুরনো লেখায়! শেক্সপীয়ারের কথা তো বাদই দিলাম। উপন্যাসের জন্মও ওই ক্ষুদ্র দ্বীপেই? প্রথম মহৎ নারী কথাসাহিত্যিকেরাও বিলাতবালা। সাহিত্যে বঙ্কিমী তীক্ষ্ণতা ও শ্লেষ থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্রীয় আর্দ্রতা ও দুর্বলের প্রতি শ্রদ্ধাও তো চার্লস ডিকেন্স-এর মতো আর কয়জনের রচনায় আমরা পাই? ডিকেন্স-এর কিস্তি যে আগ্রহ নিয়ে আটলাণ্টিক দ্বারা বিভাজিত ১৯ শতকের ইংরেজিভাষী বিশ্ব রুদ্ধশ্বাসে পড়ত, তার তুলনা শুধু প্রযুক্তির প্রগতির অনুপাতে—২০ শতকের ২০ দশকের চ্যাপলিনের চলচ্চিত্র।

অতঃপর, এটা তো স্বাভাবিক যে, শুধু অভিনবত্ব কি আবিষ্কারের কারণে নয়, স্রেফ আত্মরক্ষার তাগিদেও জেমস জয়েসকে এমন উপন্যাস লিখতে হবে যার কাহিনী চূর্ণিত, ও গুপ্তধনের মতো গ্রন্থদ্বীপের নানান বিন্দুতে লুক্কায়িত, যার ভাষা এতই দুর্ভেদ্য যে পণ্ডিত ভাষ্যকারদের টীকা বিনা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অগম্য। সাহিত্য যখন এই পথহীন কন্টককান্তারে পৌঁছেছে, পরবর্তী পরিব্রাজকের আবিষ্কারের জন্য তবে কী রইল? অসমসাহসিক স্যামুয়েল বেকেটের জন্য রইল টাকলামাকান কি গোবির চেয়েও ক্ষমাহীন নৈশব্দ্যের মরুভূমি, যার আদিগন্ত বালিয়াড়িতে শত শত মাইল ব্যবধানে আছে মাত্র দুয়েকটি শব্দের মরূদ্যান। সঠিক শব্দও নয়। অভিধান-বহির্ভূত নানান আওয়াজ, গোঙানি, শীৎকার, অস্ফুট আর্তনাদ— শব্দ নয়, শব্দের এইসব আধমোছা প্রাচীরচিত্র অন্ধকার গুহার দেশলাইয়ের চকিত আলোকে আবিষ্কার করে চলেছেন বেকেট— সাহসী, সত্যান্বেষী, নিভৃতিপ্রেমিক এবং ইংরেজী সাহিত্যের বর্তমান বদ্ধ জলাভূমিতে যুধিষ্ঠিরের প্রতীক্ষায় যেন সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান ধর্মবক।

কিন্তু তাতে আমার কী? আমার জন্ম বেলডাঙায়, (জেলা: মুর্শিদাবাদ; তখন দুই কি এক শতাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ) যা বিচারপতি স্যাডলারের রায়ের ফলে ২৮ আগস্ট ১৯৪৭ অকস্মাৎ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে।

ওই তারিখে আমি ছিলাম খুলনায়, যে জেলা আবার দুই কি এক বিন্দু শূন্য চারে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তার কয়েক সপ্তাহ আগে আজাদ হিন্দ ফৌজের কম্যাচিও জেনারেল চ্যাটার্জি খুলনার 'গান্ধী পার্ক'-এ বক্তৃতা দিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে। কিন্তু তখন আমরা—সেন্ট জোসেফ্স স্কুলের বন্ধুরা—জহিরুল, জ্যোতিপ্রকাশ, টিঙ্কু, কাজল—এমন এক প্রবল বালকোচিত জীবনজোয়ারে উজানে উঠছিলাম যার কাছে গান্ধী-প্যাটেল-রাজাজি-নেহরুদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু কোথায় ভৈরব নদ, রূপসা নদী? কোথায় মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের বাগান থেকে চুরি করা 'বাটন মাশরুমের' চেয়ে ফোলা-ফোলা আর রসগোল্লার চেয়েও মিষ্টি জামরুল? আর কোথায় ওইসব খবরের কাগজের তেতো, দুঁদে ও টেকোরা! আর, অন্তত আমার ক্ষেত্রে, তখন এমন একটা অপরিণত বয়স, যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুসুম তো দুর্বোধ্যই, শার্লট ব্রনটির জেন আয়ারও বড় বেশি ছিঁচকাঁদুনে, শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা'র ললিতা আবাল্য পাকা সাংসারিক। জন্ম যদিও মুর্শিদাবাদে, বাবার পেশার

কারণে শৈশব কেটেছিল দক্ষিণ ভারতে ও দণ্ডকারণ্যে, যেখানে ধাত্রীভাষা ছিল তেলুগু ও তামিল এবং বাড়ির বাইরের সামাজিক কথ্যভাষা ইংরেজী। সাত কি আট বছর বয়সে, কিচ্ছু না-বুঝে, একদিন 'মাদাম বোভারি' পড়ছিলুম। সে-দৃশ্য দেখে আমার বাবা, খুলনা জেলার সাহস গ্রামের ভোলা দত্ত বজ্রাহত! জোয়ার-ভাটার কারণে সুন্দরবনের সাহস গ্রামে দৈনিক দু'বার হাজিরা (চিংড়ি ও চাঁদা মাছের খাজনা) দেয় খোদ বঙ্গোপসাগর। সেই কাদা, সেই লোনাজল, তাঁর সেই শৈশবের স্বর্গ— সেই ললিত দক্ষিণী বাংলা ভাষা, যার প্রতিটি শব্দ স্বরান্ত (জাবানা/খাবানা/দো মণি)— থেকে তিনি তাঁর সন্তানদের বঞ্চিত করেছেন সামান্য অর্থোপার্জনের কারণে! সত্যই তিনি ভোলা! বৃথাই তাঁর গাঁয়ের নাম সাহস। ১৯৪৬ সালে তাই আমাদের পাঠিয়ে দেয়া হলো খুলনায়।

আমার কাছে, আমার নিজের সময়, পরিবেশ, সমাজ, ভাষা, রাজনীতি, শিক্ষাজীবন, স্বদেশ ও প্রবাস, বুঝতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' যা সাহায্য করেছে, তা অপর কোনো গ্রন্থ করেনি। সাম্প্রতিক ইতিহাস ও চিরায়ত সত্য এই মহাগ্রন্থে এক হয়ে গেছে। সুন্দরীর গালের টোলে হাসির সময় যেমন ত্বক ও আত্মা এক ঘূর্ণিতে আবর্তিত হয়, তেমন প্রতিদিনকার ঘটনা আর কালজয়ী কাব্য এক হয়ে গেছে 'পূর্ব-পশ্চিম'-এ। আমার কাছে 'পূর্ব-পশ্চিম' যুগপৎ, যত উদ্দীপক আবার হৃদয়ভাঙা, কোনো ভাষার কোনো বই-ই তত নয়। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মানিক, বিভূতিভূষণ— সবাই এর তুলনায় সুদূর। সকলের রচনাই সুন্দর। কিন্তু 'পূর্ব-পশ্চিম' শুধু সুন্দর নয়, সত্য।

এবং সমগ্র। এই ত্রয়ী কোনো একক যুগলের প্রেম, কি পরিবারের উত্থান-পতন, কি একটি যুগের কাহিনী নয়, এটি একটি জাতির দুই শতাব্দীর ইতিহাস। টলস্টয়ের, 'যুদ্ধ ও শান্তি'র মতো বিশাল এর পটভূমি, কিন্তু সুনীল টলস্টয়ের চেয়েও নির্লিপ্ত। টলস্টয়ের একটা ইতিহাস-বিষযক প্রতিপাদ্য ছিল। তিনি নেপোলিয়নকে খাটো করতে চেয়েছিলেন। সুনীলের কোনো থিসিস নেই, কোনো ইডিওলজি নেই। তিনি যেন শুধু যা জেনেছেন, তাই লিখছেন, বিচারপতির মতো কোনো দণ্ডাদেশ দিচ্ছেন না। এটা সেই অর্থে 'ইতিহাস', যে অর্থে ব্যাসদেব-হোমার-ভার্জিল আদি প্রাচীনদের রচনা 'ইতিহাস'। কিন্তু এই আণবিক বিংশ শতকে এমন সমগ্রতার প্রয়াস স্রোতের বিরুদ্ধে বাওয়া। এ শতকে সাহিত্যের একুশ ধারার প্রথম আইনই হলো শিল্পী এক অনন্তশয়ান ধ্যানমগ্ন বিষ্ণু যাঁর নাভি থেকে উত্থিত পদ্মের নামই শিল্প। সবই মায়া। 'বাহ্যিক জগৎ' বলতে কিছু নেই : পিকাসোর আঁকা প্রতিকৃতিতে যেমন একই মুখে তিনটে নাক কিংবা কান, কিংবা ঠোঁট ছবির যে-কোনো জায়গায় শিল্পীর খেয়ালমতো বসানো থাকতে পারে, তেমন তথাকথিত 'বাস্তব'কে সব শিল্পীই তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী পুনর্গঠন করে নেন। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত দর্শন। এ নিয়ে খোদ আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল, এবং ওই দেবতারাই যখন এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি, আমরাই বা কী করে ধ্রুব বলে প্রচার করতে পারি যে একটা বাহ্যিক সত্য আছে— কিংবা নেই--যা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ ? কিন্তু এটুকু তো

বলতে পারি যে ঠিক যেমন ট্রেনে যেতে-যেতে মনে হয়, ওইখানে একটা সত্যিকার পাহাড় আছে, যার পাশে বইছে একটা শিলা-টপকানো নদী, ট্রেন থেকে নেমে একটু হেঁটে যেখানে যাওয়া যায়, পাথরের ওপর বসে জলে যায় পা চোবানো, তেমনই সুনীলের ত্রয়ী মনে হয় বানানো গল্প নয়, তা যেন সত্য। এবং যদিও তাঁর শব্দগুলি অতি যত্নে চয়িত, তাঁর ভাষা, জয়েস কি কমলকুমার মজুমদারের ভাষার প্রতিতুলনায়, নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তা মনে হয় ট্রেনের জানলার ওই কাচের মতো স্বচ্ছ। এবং সে কাচে যেন কোনো বুদবুদ, কোনো টোল, কোনো ঢেউ নেই। তাঁর কল্পনায় নেই কোনো এক্সেন্ট্রিসিটি, কোনো আত্মমগ্নতা, নিজেকে নিয়ে বড়াই। যদিও তাঁর ত্রয়ীর প্রত্যেকটিরই ভাষাশৈলী স্বতন্ত্র, তাদের সামান্যধর্ম হলো যা তাঁর ভাষা বাতাসের মতো সর্বত্র আছে কিন্তু নিরঞ্জন, যার মধ্যে কোনো সচেতন চেষ্টা বিনাই নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে তাঁর চরিত্রেরা।

জয়েস, টমাস মান, বুদ্ধদেব বসুর গদ্যশিল্প যেন বলে 'আমাদের দেখ ; শুধু বার্তা নয়, বাহনটির দিকেও দৃষ্টি দাও। কী অপূর্ব শিল্পীতাই দেখ আমাদের পৃষ্ঠাব্যাপী পদসমূহের কী নিপুণ বিন্যাস!' আর সুনীলের গদ্য? আমার হাতের কাছে এখন আছে কেবল দুই খণ্ড 'পূর্ব-পশ্চিম'। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৫৫ এবং ৬২৬। এই ১৩৮১ পৃষ্ঠার মধ্যে 'লেখকের কথা' কিংবা 'পাবলিশার্স ব্লার্ব' বাদ দিয়ে, মূল উপন্যাসে বোধহয় একটিও বাক্য নেই যার শব্দসংখ্যা কুড়ির অধিক। গড়ে আট কি দশ। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ যে পড়েছে, অর্থাৎ সব সাক্ষর বাঙালির পক্ষেই তার জাতির এই ইতিহাস অধিগম্য। এটাই হচ্ছে প্রকৃত 'জনগণ'-এর বই। বেশির ভাগ সংস্কৃত কাব্য কৃত্রিম। তা প্রধানত রাজ সভাসদ ও পণ্ডিতদের জন্য লেখা। মহাভারতের ভাষা সরল। তা সাধারণ মানুষের সম্পদ। 'পূর্ব-পশ্চিম' হচ্ছে বাঙালির মহাভারত। ফলে, এটা যেমন বাঙালির আদরের, তেমন এটাও নিশ্চিত যে অন্যদের কাছে এর তেমন কদর হবে না। যেমন ইংলণ্ডের ইতিহাস-বিষয়ক শেক্সপীয়ারের নাটকের—তাঁর 'ক্রনিকল প্লেজ'-এর তেমন কদর নেই ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, জার্মানীতে, যেমন আছে 'হ্যামলেট', কি 'কিং লিয়ার'-এর। বিশ বছরের অধিক এই হাজার হাজার পাতায় লক্ষ-লক্ষ শব্দ জুড়ে সুনীল যা রচনা করেছেন তার স্থাপত্য ও ওজন আমাকে রোমের অ্যাকুইডাক্ট কিংবা চীনের প্রাচীর-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এটার জন্য তিনি কোনো 'বুকার প্রাইজ', কিংবা 'প্রি গঁকু' পাবেন না। দেশের জন্য ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছেন অনেকে। সাবমেরিনে মহাসমুদ্র অতিক্রম করে বিমান দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে শেষ হলো সুভাষচন্দ্রের।

দেশের জন্য একজন সাহিত্যিক কী সাধনা ও আত্মত্যাগ করতে পারেন যা 'পূর্ব-পশ্চিম'-এর অধিক।

এই মহাকাব্যটি শুরু হচ্ছে এক অত্যন্ত, আক্ষরিক অর্থে, গতানুগতিকভাবে: ঘোড়ার গাড়ির মাথায় সতরঞ্চি-বাঁধা বেডিং চাপিয়ে পূর্ববঙ্গের একদা-ধনী এক জমিদারবংশের দেশভাগের কারণে উৎপাটিত কাঞ্চন প্রতাপ মজুমদারের, সপরিবারে ছুটিতে দেওঘর যাত্রা দিয়ে। প্রথম গন্তব্য হাওড়া স্টেশন।

"যাত্রা শুরু হলো পৌনে সাতটায়। বাগবাজার থেকে মণীন্দ্র কলেজের পাশ দিয়ে সেণ্ট্রাল এভিনিউ। মমতার এক পাশে বাবলু আর মমতার কোলে মুন্নি। উল্টোদিকে প্রতাপ আর পিকলু। বাবলু ছটফটে ছেলে, এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে পারে না, বারবার সে বাইরে উঁকি মারছে। মাড়োয়ারিদের একটা বিয়ের মিছিল যাচ্ছে, প্রচুর আলো আর বাজনা, ঘোড়ার পিঠে বসে আছে জরির পোষাক পরা বর, তার কোমরে তলোয়ার, বাবলু অনেকখানি মুখ ঝুঁকিয়ে দিতেই মমতা সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, এই, কী করছিস, মাথায় ধাক্কা খাবি, তবে বুঝবি। দ্যাখ তো দাদা কেমন চুপ করে বসে আছে।

"পিকলু বলল, বাবলু, তুই আমার জায়গায় আসবি? এখানে বসে ভালো দেখা যাচ্ছে।

"বাবলু তাতে রাজি নয়। মায়ের পাশ ছেড়ে, সে বাবার পাশে যেতে চায় না। সেই জন্যই তো সে আগে থেকে গাড়িতে উঠে এই জায়গাটা নিয়ে নিয়েছে।

"প্রতাপ কোনো কথা বলছেন না, থুতনিটা উঁচু করে আছেন। তাঁর মুখখানি বিষণ্ন গম্ভীর। যদিও সপরিবারে তিনি বেড়াতে যাচ্ছেন, তবু তাঁর এখন মনে পড়ছে অন্য কথা।

প্রতাপ সজাগ হলেন হাওড়া ব্রিজের উপর এসে। সাংঘাতিক ট্র্যাফিক জ্যাম। দশ মিনিটে এ গাড়ির ঘোড়া এক পা-ও এগোলো না। ওপর থেকে কানু বললো, সেজদা, সামনে একেবারে সলিড জ্যাম। কিছুই নড়ছে না।..."

গাড়ির ঘোড়া এক পা-ও এগোল না বটে, গল্পের গাড়ি কোথায়-না-কোথায় চলল! দেওঘর, ত্রিকূট পাহাড়, ঢাকা, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, মহাকাশ— সুনীলের ম্যাজিক কার্পেটে একবার চেপে বসলে, থামার ইচ্ছেই হয় না। আমি গত কুড়ি বছরে, কবিতা ও প্রবন্ধ ছাড়া, উপন্যাস ক'টা পড়েছি? দৈর্ঘ্য ৩০০পৃষ্ঠার ওপর হলে আমার ধৈর্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অরুন্ধতী রায়-এর 'দ্য গড অব স্মল থিঙস' পড়তে শুরু করেছিলাম খবরের কাগজের কারণে (তখনও 'বুকার পুরস্কার' পাননি, কিন্তু নিউ ইয়র্কের প্রকাশক মহলে তখনই তিনি এক প্রবাদনারী), কিন্তু শেষ করেছিলাম তাঁর ভাষার চারুতা, চিত্রময়তা ও কবিতার কারণে। ম্যাক্যা-র (জানি না, উচ্চারণ কী হবে, কারণ তিনি, জাতিতে রুশ, লেখেন ফরাসীতে) 'রিমেম্ব্রন্স অফ এ রাশিয়ান সামার্স' পড়েছি, কারণ তিনিই একমাত্র অ-ফরাসি লেখক যিনি ফরাসিতে উপন্যাস লিখে ওই ভাষাগর্বী জাতির শ্রেষ্ঠ দুটি পুরস্কার— 'প্রি গঁকু' ও 'প্রি মেদিচি'— একযোগে গত বছর পেয়েছেন, যা ইতিহাসে ঘটেনি, যা এমনকি মাতৃক্রোড় থেকে ফরাসিভাষী কোনো প্রুস্ত কি সার্ত-এর বরাতেও হয়নি। পড়েছি রুশদি, এবং যেমন বুঁদ হয়ে গেছি তাঁর ভাষার যাদুতে, তেমন স্তম্ভিত হয়ে গেছি তাঁর সাহসে। সম্রাট জাহাঙ্গির কাশ্মীরে গিয়েছিলেন ২২ বার, এবং ওই ভূস্বর্গের ফণা ও ফ্রোরার বিষয়ে তিনি যা লিখেছিলেন তা একজন ভারতবিদ্ ন্যাচারালিস্ট আমাকে আমেরিকায় বলেছিলেন আজকের পণ্ডিতদেরও পাঠ্য। সালমন রুশদি হচ্ছেন উপমহাদেশের সাহিত্যের সম্রাট জাহাঙ্গির।

একটু বিদেশী, একটু দাম্ভিক এবং বহু শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক। ভারতীয় চিত্রকলার তিনি হলেন মেদিচিতম। তাঁকে কুর্নিশ। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়?

রুশদি যদি বাংলা পড়তে পারতেন, এই ত্রয়ী পড়ে তিনি হয়তো দু-তিন রাত স্তম্ভিত হয়ে কাটাবার পর বলতেন: 'ইনি তো খোদ খোদা! বিধাতার মতোই ইনি সর্বজ্ঞ, যেমন বোঝেন কোনো ঢোঁড়া সাপ কি জবাইয়ের জন্য চিহ্নিত মোরগের আতঙ্ক, তেমনই তো দেখছি বোঝেন শেখ মুজিবর রহমান কি জুলফিকার ভুট্টোর যুক্তি ও ক্ষমতার মধ্যে দোটানা। কিন্তু তার চেয়েও যা রহস্যময়, তা হলো সময়ের অগ্র-পশ্চাৎ, ভূত-ভবিষ্যৎ, কী করে তাঁর কাছে এমন পরিষ্কার? তিনি কি যখন ওই প্রথম পরিচ্ছেদে বাগবাজার থেকে হাওড়া হয়ে দেওঘর যাত্রা লিখতে শুরু করলেন, তখনই কী জানতেন মমতার ভালো ছেলে পিকলুর কিংবা কোচের ওপরে বেডিং-এর পাশে উপবিষ্ট প্রতাপের দূর সম্পর্কের ভাই কানুর, কিংবা এই পুরো উপমহাদেশেরই ভবিষ্যৎ? নইলে এমন অগ্র-পশ্চাৎ, চতুষ্কোণ ও গম্বুজ ঠিক-ঠিক মাপ রেখে কী করে ওই তাজমহলের মতো সৌধের নকশা করলেন?'

পাঠক, আমি অতিরঞ্জন করছি না। বাস্তবে যেমন ভয়ালতম ট্র্যাজেডি আসে প্রাত্যহিকতার ছদ্মবেশে, প্রতাপ পরিবারের এই ঘোড়ার গাড়ির যাত্রার অঙ্কুরেই এই উপমহাদেশের পরবর্তী সব গড়ন-ভাঙন, আবেগ-আবর্ত-বিপ্লব নিহিত। পাঠক, ওপরে যে অংশ উদ্ধৃত করলাম তার আপাত শিল্পহীনতায় প্রতারিত হবেন না। টলস্টয় 'আনা কারেনিনা' কীভাবে শুরু করেছিলেন? জেন অস্টেন কীভাবে 'প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস'? তাঁদের চেয়ে ঢের ঢিমে তেতালায় শুরু 'পূর্ব-পশ্চিম'-এর, কিন্তু এই যে মহাগ্রন্থ যে উপত্যকা ও শিখর অতিক্রম করেছে তা এমনকি মার্কেথের 'হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড'-ও করেনি।

ব্লেক যেমন ইটার্নিটি দেখেছিলেন একটি বালির কণায় ও ঘাসের শিষে, সুনীল দেখেন অন্যের-যা-চোখে-পড়ে না এমন অনুপুঙ্খে। ট্রাফিক জ্যামের ফলে আটকে যাওয়া ঘোড়ার গাড়ি ছেড়ে বেডিং ও টিকিট নিয়ে ট্রেনের জায়গা দখল করতে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল পিকলু ও কানু। পশ্চাদ্‌বর্তী মমতা-প্রতাপ-বাবলু স্টেশনে ওদের খুঁজে পাচ্ছে না।

"কোন্ কামরায় উঠলো ওরা? ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, ইন্টার ক্লাস, থার্ড ক্লাস। এর মধ্যে থার্ড ক্লাসেই কোনো আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই, তার ফলে কুমড়ো গাদাগাদি অবস্থা। কোনো দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবার উপায় নেই। প্রত্যেকটি থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টের কাছে গিয়ে প্রতাপ জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন, কানু, পিকলু।

"শেষ পর্যন্ত একটা হাত একটা কামরার জানলা দিয়ে বেরিয়ে এলো। সেটা যে-কোনো কিশোরেরই হাত হতো, কিন্তু মমতা দেখেই চিনলেন।..."

একে কী বলব? মায়ের চোখ? লেখকের সর্বজ্ঞতা? যাই নাম দি, এ রকম কণা-কণা অনপুঙ্খ দিয়ে লেখক সৃষ্টি করেছেন একটি সমগ্র যা যৌবন ও বার্ধক্য, বাঙাল ও ঘটি, ইওরোপ-আমেরিকা ও ভারতীয় উপমহাদেশ— সব-কিছুকে ধারণ করে আছে।

কথ্য বাংলার কত না তরঙ্গ এই লেখকের শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধরা পড়ছে। প্রতাপের মা, সুহাসিনী, যে 'বাঙাল' তা লেখককে সাংবাদিকের মতো তথ্য হিসেবে জানিয়ে দিতে হয় না। সংলাপই যথেষ্ট।

"সুহাসিনী বললেন, অগো তো মুখ শুকনা দেখি না, ভালোই তো দেখি, খুকনেরই তো দেখি চক্ষের নিচে কালি।"

বাঙাল ভাষার মধ্যেও যে জেলায়-জেলায় কত ভেদ, এক কলকাতার উত্তর-দক্ষিণেই যে উচ্চারণের কত তফাত (কেউ বলে 'গেসলাম', কেউ বলে 'কিনিচি'।), লণ্ডনের ছেলেটি এক রকম বাংলা বলে, আর আমেরিকা-প্রবাসী পশ্চিমবঙ্গীয়েরা বাংলা প্রায় একদম ভুলেই গেছে, তা এই বঙ্গীয় প্রফেসর হিগিনস শুধু চর্চা করেননি, প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য চিহ্নকরণে কাজে লাগিয়েছেন সেই জ্ঞান। একদিন শুধু বাংলা সাহিত্যের এম এ ক্লাসে নয়, ভাষাতত্ত্ব বিভাগেও 'ত্রয়ী' নিয়ে বহু গবেষণা হবে। আমি শুধু এখানে কিছু কিছু জিনিস ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছি, যা নিয়ে পণ্ডিতেরা নিশ্চয় ভলিউমের পর ভলিউম লিখবেন। শুধু এটা বলব, বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে স্রেফ চরিত্র-সংখ্যায়, কি ভৌগোলিক ব্যাপ্তিতে, কি ঘটনার ঐতিহাসিকতায় কিংবা বহুবর্ণ রঞ্জনে এমন বিস্তৃতি আর কোনো লেখক দেননি। না, এমনকি 'আনন্দমঠ'-এর বঙ্কিম, কি 'গোরা'-র রবীন্দ্রনাথ কি 'শ্রীকান্ত'-এর শরৎচন্দ্র। ঠিক, অনেক বিষয়ে সুনীলকে আমার মনে হয়েছে অগভীর। ইন্দিরা গান্ধীকে তিনি যতবার উল্লেখ করেছেন, এবং যে শ্রদ্ধা ও মনোযোগ-সহ, সে তুলনায় সুভাষচন্দ্রের উল্লেখ মনে হয় ব্যঙ্গোক্তি। আশ্চর্য, তাঁর কবিতার ব্যবহার, কিন্তু ইংরেজী কোটেশনে তাঁর হোঁচট কামিনী আতপে কাঁকরের মতোই বিরক্তিকর। জীবনানন্দের, এমন একটি শৈশবরচনাকে তিনি উপন্যাসের সঠিক জায়গায় উদ্ধৃত করেছেন যাতে ওই কবিতাটি ল্যাজেরাস-এর মতো পুনর্জন্ম পেয়েছে।

এ ভারতভূমি নহেক তোমার, নহেক আমার একা
হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছায়া, —মুসলমানের রেখা;—
...কাফের, যবন টুটিয়া গিয়াছে,
ছুটিয়া গিয়াছে ঘৃণা,
মোসলেম বিনা ভারত বিফল, বিফল হিন্দু বিনা...

আর এত (অন্তত কলকাতার তথাকথিত 'এলিট'-এর কাছে) অপরিচিত শব্দকে তিনি বাংলা সাহিত্যের ফরাশে বেলফুলের মালা গলায় বসিয়ে দিয়েছেন,— যথা চিংড়ি কিংবা পেয়ারার পূর্ববঙ্গীয় প্রাদেশিক নাম—যার প্রায় তুলনীয় শেক্সপীয়ার-কর্তৃক ইংরেজি ভাষার শব্দসংখ্যার বৃদ্ধি। আবার, ভ্রমণের গাইড হিসেবেও তিনি সম্ভবত ফিয়োডরের চাইতে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু একটি বিভাগে শরৎচন্দ্র কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া তাঁর তুলনীয় কোনো বাঙালি লেখকের কথা ভাবতেই পারি না, তা হচ্ছে প্রাণের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি, এবং মানব পুরুষের চক্ষে অন্তত— বিধাতার যা সেরা হাতের কাজ, নারী, তা হচ্ছে সুনীলের সহমর্মিতা ও ভালোবাসা।

আমি একদা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বিষয়ে লিখেছিলুম যে বন্যার

বর্ণনা 'পদ্মা নদীর মাঝি'তে যেমন আছে, তেমন কোথাও পড়িনি। স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি/বহু দশকের বৃষ্টিপাতে যাকে একদা মনে হয়েছিল শিলালিপি, তা হায় অস্পষ্ট।

"কমে মাঠ-ঘাটের জল।
কমিবেই তো।
উহা তো মানুষের চোখের জল নয়।
জল কমিতে, কুবের কুটুম্বদের খবর লইতে চলিল।"

কিন্তু 'পূর্ব-পশ্চিম' পড়ার পর আমি মত বদল করতে বাধ্য হয়েছি। বর্ষাকালে পূর্ব বাংলার গাঁয়ের যে বর্ণনা সুনীল লিখেছেন, পৃথিবীর সাহিত্যে কী তার তুলনীয়? আমি তো জানি নে। 'পূর্ব-পশ্চিম'-এর দুই প্রধান চরিত্র: প্রতাপ ও মানুন।

দুই বন্ধু ঝড়ে মামুনের গাঁয়ে গিয়েছিল। সেই সাইক্লোনের যে বর্ণনা আছে তা 'শ্রীকান্ত'-এর বর্মাযাত্রায় সাইক্লোনের চেয়ে আমাকে বেশি আকর্ষণ করেছে কারণ সুনীলের লেখায় কোনো অতিশয়োক্তি নেই, তা মনে হয় কার্টুন নয়, ডকুমেন্টারি। নৈতিক ও চিত্রগত ঘনত্ব সুনীলের ওই ঝড়ের বর্ণনায় আছে, আমি তো কেন, বোধহয় আমাদের শতাব্দীসেরা কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখতে পারতেন না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'-তে প্লাবন প্রশমনের ওই অমর বর্ণনার উদ্ধৃতিতে যদি কোনো শব্দের আমি এদিক-ওদিক করে থাকি, পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। প ন ম থেকে এই কোটেশন করছি। অন্তত ১০ হাজার মাইল এবং পাক্কা ৪০ বছর দূরত্ব থেকে। কিন্তু হয়তো এই দূরত্বের জন্যই অংশটির একটি দুর্বলতা চোখে পড়েছে, যা সুনীলের রচনায় কোথাও নেই। সুনীল বিধাতার মতো নিরপেক্ষ, তাঁর সংসারে সকলেরই সমান স্থান। নরমাংস খাদক আর শাকাহারী, শ্বেত ও লোহিত কণিকা, অ্যামিবা ও অ্যান্ড্রোমিডা নেব্যুলা। এবং মায়া, মমতা, সুবিচার নেই। 'পূর্ব-পশ্চিম'-এর যে ছেলেটি সবচেয়ে মধুর, ভালো, প্রায় বলা যায় মর্ত্যের দেবদূত এবং যাকে আমি মনে মনে বরণ করেছিলুম বঙ্গকুমার রূপে, কী অকস্মাৎ ও লেখক-কর্তৃক আপাত-প্রস্তুতিহীন তার মৃত্যু। অথচ আসলে শত শত পাতা ধরে ধরে তিনি পিকলুর মৃত্যুর জন্য আমাদের সাবলিমিনাল লেভেলে প্রস্তুত করছিলেন। এই সেই পিকলু, পিতার গোপন গর্ব, বাবলুর ভালো দাদা, মানব শরীরের দ্বারা অবরুদ্ধ ট্রেনের কামরা থেকে বার করা যার হাতটুকু দেখে মা মমতা বলে উঠেছিলেন, ওই তো পিকলু! কিন্তু পিকলুর নির্বিকার, নিরপেক্ষ, উদাসীন স্রষ্টা তার এই তিলোত্তম সৃষ্টির মৃত্যুতে কোনো আবেগই প্রকাশ করেন না। প ন ম-র বিশাল প্যানোরামার মধ্যে কিন্তু হঠাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়— যিনি ছিলেন বিধাতা— তিনি হঠাৎ মানবোচিত দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেললেন। সাংবাদিকতার প্রফেশনাল ভাষায় একে বলে 'এডিটোরিয়ালাইজিং'। অর্থাৎ রিপোর্টিংয়ের শাকের মধ্যে নিজের সম্পাদকীয় মাছ লুকিয়ে রাখা!

আর ঝড়? শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-এ বঙ্গোপসাগরে যে সাইক্লোনের বর্ণনা আছে তা শৈশবে পড়ার পর থেকে আমার চোখে যে আল্ট্রামেরিন ব্লু-র নীলাঞ্জন লেগেছে,

তা আজও মোছেনি। কিন্তু এখন মনে হয় তাঁর বর্মাযাত্রার পথে সমুদ্রে ঝড়ের বর্ণনায় বিশেষণ বেশি, ছবি কম। সমুদ্রে ঝড়ে পড়া কী জিনিস তা তাঁর অধিকাংশ পাঠকেরই যে অজানা, তা ওই মহৎ লেখক জানতেন। হয়তো সেইজন্যেই সাইক্লোনের ভয়ালতা বোঝাবার জন্য তিনি কিঞ্চিৎ রেটোরিকল গিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রতাপ এবং তার বন্ধু মামুন দায়ুদকান্দির ফেরিঘাট থেকে মামুনদের বাড়ি যাওয়ার পথে প্রথম যে প্রাকৃতিক ঝড়ে এবং তারপর হিন্দু-মুসলিম ঘূর্ণাবর্তে পড়ল, তাতে মনে হয় লেখক যেন তুলি ছেড়ে ক্যামেরা হাতে নিয়েছেন। এবং ঝড়ের শক্তি প্রকাশিত হয়েছে কোনো বিশেষণে নয়, একটা পাখির ধাক্কায়। মেঘনা নদী পার হয়ে দায়ুদকান্দির ফেরিঘাট থেকে হাঁটা পথ। "...তখন দুপুর তিনটে কিন্তু ঝড় এলো যেন এক রেলগাড়ি ভর্তি অন্ধকার নিয়ে। চৈত্র-বৈশাখ মাস হলেও কথা ছিল, আশ্বিনে এমন ঝড় যেন অবিশ্বাস্য। ঝড় যে মানুষকে উড়িয়ে, তা বিশ্বাস করা সহজ নয়, কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল তা অসম্ভব নয় মোটেই। মাঠের মধ্যে এসে প্রতাপ আর মামুন ঝড়ের ধাক্কায় পড়ে যাচ্ছিল বারবার।... বাতাস যেন কোনও অদৃশ্য শক্তির হাত, ওদের চুলের মুঠো ধরে টানছে। প্রতাপ সত্যিকারের মৃত্যুভয় পেয়েছিল সেদিন, বিশেষত সেই মুহূর্তটায়, যখন কিছু যেন একটা জীবন্ত জিনিস প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল তার মাথায়; সেটা ছিল একটা শঙ্খচিল, ঝড়ের দাপটে সে একটা গুলির মতন ছিটকে এসেছিল।..."

এরপর যা ঘটল, সেটা হিন্দু-মুসলিম অহঙ্কার ও সঙ্ঘর্ষের মূল ব্যাপারটা। কিন্তু সুনীল এটা প্রকাশ করতে বাগ্মীতার আশ্রয় নেননি। কোনো কোনো অংশে সুনীলের গদ্য এত স্বচ্ছ যে, পাঠক ভাবেন এটা তো বাস্তব, ধরতেই পারেন না যে এটাও মায়া, ধরতেই পারেন না যে এটাও আমাদেরই মতো কোনো রক্তমাংসের বাঙালি, যিনি এই কলকাতারই বালিগঞ্জ অঞ্চলে 'পারিজাত' নামে এক অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে বাস করেন, রচনা করেছেন শব্দের পর শব্দ বসিয়ে, এই কিমিউলাস মেঘের প্রাসাদ একদম শূন্যে বানিয়েছেন। এবং যার গোলাপ-নীল হাওয়ায় মিঠায়ের ফাঁক দিয়ে আচমকা নেমে আসে হিন্দু-মুসলিম ভেদের বজ্র। যদিও ঈর্ষাতুর প্রতিযোগীরা শেক্সপীয়ারের 'Little Latin and less Greek' নিয়ে খোঁচা দিতেন শেক্সপীয়ার প্লটার্ককে এমন চমৎকার আত্মসাৎ করেছিলেন যে তাঁকে তাঁর পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করার কোনো প্রয়োজন হতো না। সুনীলও তেমন, শুধু বাংলা কবিতা নয়, বিশ্বসাহিত্যকে এমন উত্তম রূপে জীর্ণ করেছেন যে তাঁকে তাঁর পাণ্ডিত্যের বায়ুত্যাগ করতে হয় না। তাঁর বাংলা ভাষার কান যে ডিজিটাল স্ক্যানারের চেয়েও সূক্ষ্ম, তা তো জানাই। কিন্তু তাঁর গানের কান?

আমি 'পূর্ব-পশ্চিম'-এর এই আলোচনা দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করব; আমি নিশ্চিত যে একদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা রবীন্দ্রভারতী থেকে এই মহাকাব্যের একেকটা পর্ব নিয়ে বিশ-পঁচিশটা ডিফিল বেরুবে।

প্রথম উদ্ধৃতি: তাঁর গানের কান, তাঁর সহানুভূতি, তাঁর নির্মমতা।

প্রতাপরা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে দেওঘর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে যেখানে

তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন প্রতাপের ভায়রা বিশ্বনাথ। এই বিশ্বনাথ কৈশোরে কীটস-অধিক রোম্যান্টিক, এমন বিশুদ্ধ বোহেমিয়ান যে তাঁর তুলনায় হয়তো আমাদের প্রজন্মের সবচেয়ে গানপাগলা ভবঘুরে দীপক মজুমদারও নেহাত গেরস্ত, হয়তো ঋত্বিক ঘটকও সংসারী। অথচ এই বিশ্বনাথেরই এমন পতন তিলে তিলে পয়েন্টিলিস্ট চিত্রকর স্যুরাটের মতো আঁকলেন যে আমার তো মনে হয় বঙ্গভঙ্গ কি ভারত বিভাগের চেয়েও বিশ্বনাথের পতন হচ্ছে বড়ো ঘটনা, গিবন্‌স-এর 'দ রাইজ অ্যাণ্ড ফল অফ দ্য রোমান এম্পায়ার'-এর চেয়ে বড়ো ঘটনা, কারণ এখানে সুনীল দেখাচ্ছেন অবস্থা বৈগুণ্যে কী করে একটি স্বর্গীয় কুসুম হয়ে যেতে পারে নরকের-বিষফুল। একটা ভালো মানুষের পতনের এরকম পুলিসের মতো কেস হিস্ট্রি বাংলা সাহিত্যে অন্যত্র কোথায়? তাই উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘই করছি।

"দেওঘরে আসার প্রস্তুতির সময় থেকেই প্রতাপকে টাকাপয়সার চিন্তা করতে হচ্ছে। বড় বাজারের এক সাহাদের দোকানে তাঁর বাবার আমলের সাড়ে তিন হাজার টাকা পাওনা আছে, সে টাকা এখন তারা দিতে চাইছে না। প্রতাপের নিজস্ব সঞ্চয় ফুরিয়ে আসছে। পিকলু কলেজে ভর্তি হয়েছে, এবার থেকে তার জন্য একটা বড় খরচ আছে। দেওঘরে গানের ইস্কুল খুলে বিশ্বনাথ গুহর উপার্জন যৎসামান্য, তাঁর কাছে প্রতাপ সপরিবারে গিয়ে উঠবেন, খরচপত্র সব প্রতাপেরই করা উচিত। বিশ্বনাথ কিন্তু আয়োজন করে রেখেছেন তাঁর সাধ্যের চেয়ে অনেক বেশি।

বাড়িটি ছোট হলেও সংলগ্ন জমি আছে বেশ খানিকটা। এককালে বাগান ছিল, তার বিশেষ চিহ্ন এখন না থাকলেও কয়েকটি বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছ ও আতা গাছ আছে। এক কোণে কেয়ার-টেকার ভজন সিং-এর ঘর। এই ভজন সিংয়ের দুই বউ, তারা একই সঙ্গে থাকে। তার মধ্যে একটি বউ আবার নেপালী, সে বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারার ও মধ্যবয়েসী। ভজন সিং কী করে যে এই নেপালী স্ত্রীটি জোগাড় করলো তা কে জানে। দুই পক্ষের দুটি করে ছেলেমেয়ে। ভবদেবের আমলে ভজন সিং-এর মাইনে ছিল আঠারো টাকা, এখন তা বেড়ে পঁচিশ হয়েছে। এই টাকায় সে কী করে সংসার চালায় তা এক রীতিমতন রহস্য। অথচ খেয়ে-পরে তো বেশ আছে, ছেলেপুলেদের স্বাস্থ্যও খারাপ নয়। এ বাড়ি যতদিন খালি পড়েছিল ততদিন ভজন সিং মালিকের অনুমতি ছাড়াই প্রায়ই চেঞ্জারদের ভাড়া দিত, সে খবর প্রতাপের কানে গেছে, কিন্তু মাঝখানের কয়েকটি বছর কলকাতা-ঢাকার ব্যাপার নিয়ে প্রতাপ এমন ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, এদিকে মনোযোগ দিতে পারেননি।

বাগানের একদিকে ভজন সিং-এর কোয়ার্টার চ্যাচার বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে গোটা দশেক ডাগর চেহারার মোরগ ঘুরছে। ঐগুলি বিশ্বনাথের সম্পত্তি। প্রতাপদের দেশের বাড়িতে মুর্গী ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল, এখানেও সুহাসিনী এসে পড়ায় সেই নিয়ম স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বনাথ অনেকগুলি বছর পশ্চিমে কাটিয়েছেন, মুসলমান ওস্তাদদের সংস্পর্শে থেকেছেন, তাই তাঁর খাদ্যরুচি অন্যরকম। গরু-ভেড়া-মুর্গী সবই চলে। প্রতাপ অবশ্য গো-মাংস কোনোদিন স্পর্শ করেননি, তবে কুক্কুট মাংসে তাঁর আপত্তি নেই। বিশ্বনাথ তা জেনেই আগে থেকে অতগুলি মোরগ কিনে

রেখেছেন। মোরগ আর মুর্গীর মধ্যে বিশ্বনাথ নিজে আবার মুর্গী পছন্দ করেন না। এ ছাড়া বিশ্বনাথ সঞ্চয় করে রেখেছেন পাঁচ সের অতি উৎকৃষ্ট ঘি, এক মণ দাদখানি চাল, মটর-মুসুরি-সোনামুগ ইত্যাদি নানারকম ডাল, আধ মণ করে আলু ও পেঁয়াজ, এক বস্তা চিড়ে, অনেকগুলো পাটালি গুড়, আরও কত কী। তাঁর শ্যালক যাতে বাজার খরচা করতে না পারে সেইজন্যই বিশ্বনাথের এই বন্দোবস্ত। প্রথমদিন এসে এসব দেখেই প্রতাপ বুঝতে পারলেন তাঁর ছোড়দির দু'একখানি গয়না নিশ্চিত জলাঞ্জলি গেছে। বিশ্বনাথ যেমন পাগল, শান্তি আবার ততটাই নরম। বিয়ের পর থেকেই প্রায় মায়ের কাছে থেকেছেন বলে তাঁর সংসারবুদ্ধি হয়নি। বিশ্বনাথ আগেও তাঁর স্ত্রীর গয়না ভেঙেছেন, প্রতাপ জানেন। ভবিষ্যৎটা যে কী করে চলবে তা এরা দু'জনেই বোঝে না। প্রতাপ মনে মনে ঠিক করে রাখলেন, ওস্তাদজীর সঙ্গে পরে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

বেশ হৈ চৈ করে এখানে দিন কাটতে লাগল। দু'বছর পর পারিবারিক মিলন। দেশের বাড়িতে সেই প্রতি বছর পুজোর সময়ের যে আনন্দ তা তো আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তবু দেওঘরের পরিবেশটি বেশ মনোরম।

সকালবেলাতে বিশ্বনাথের গানের স্কুল বসে। বছরের অন্য সময়ের তুলনায় সেই সময়টাতেই বিশ্বনাথের ছাত্রছাত্রী জোটে একটু বেশি। খানিকটা শীত পড়লেই যক্ষ্মা রুগীরা হাওয়া বদলের জন্য দু তিন মাস বাড়ি ভাড়া করে এখানে সপরিবারে থাকে। তাদের ছেলেমেয়েরা জুটে-যায় বিশ্বনাথের ইস্কুলে। বিশ্বনাথের আফশোস তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত জানেন না। ইদানীং ঐ গানের খুব চাহিদা। গার্জেনরা এসে বলেন, মাস্টরজী, দুতিন খানা রবীন্দ্রসঙ্গীত তুলিয়ে দিতে পারেন না? মেয়ের বিয়ের সময় আজকাল যে পাত্রপক্ষ রবীন্দ্রসঙ্গীত চায়!

বাইরের টানা বারান্দায় শুরু হয় ক্লাস। এখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এগারো জন, মাইনে প্রত্যেকের পাঁচ টাকা। শান্তি বলছিলেন, কেউ কেউ মাইনে না দিলেও বিশ্বনাথ কিছুতেই চাইবেন না। টাকা নিয়ে গান শেখাতে হচ্ছে বলে বিশ্বনাথের মনে এমনিতেই গ্লানি রয়ে গেছে।

মমতা জোর করে পিকলু, বাবলু, মুন্নিকেও জুড়ে দিয়েছেন গানের ক্লাসে। পিকলু তবু কথা শোনে, কিন্তু বাবলু-মুন্নি কিছুতেই বসতে চায় না, মমতা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পাহারা দেন। সবাই এক টানা গান ধরে:

এ বি মইকা সব সুখ দিও
দুধ পুত আওর ধন জন লছমী।

একবার এ পর্যন্ত হলেই বিশ্বনাথ চেঁচিয়ে বলেন, আবার ধরো, এ বি মইকা...।

সুরটা প্রতাপের কানে লাগে। প্রথম দিন তিনি বিশ্বনাথকে বলেছিলেন, ওস্তাদজী আপনি সক্কালবেলাতেই পূর্বী সুর গাওয়ান কেন ওদের? আশাবরী বা রামকেলি ধরালে হতো না?

বিশ্বনাথ হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন, আরে শিশুদের আর সকাল-সন্ধে

কী? ওদের তো যতক্ষণ জেগে থাকা, সেই সব সময়টাই উৎসব! তাই না? তাছাড়া তুমি লক্ষ্য করবে, ব্রাদার, অবরোহণের সুর বাচ্চাদের গলায় সহজে আসে, ভালো আসে।

ইস্কুল-পর্ব শেষ হলে ভজন সিং-এর কোয়ার্টারে মোরগ কাটা শুরু হয়। বিশ্বনাথ চুরুট টানতে টানতে নির্দেশ দেন। কাজটি সহজ নয়। প্রত্যেকদিনই একটা না একটা মোরগ বেড়া ডিঙ্গিয়ে পালায়। যে মোরগটিকে কাটা হবে সেই কি টের পায়, নাকি যে পালায় তারই ওপর মৃত্যুদণ্ড পড়ে! ভজন সিং-এর ছেলেমেয়েরা আর পিকলু বাবলুরা সেই মোরগ ধরে আনার জন্য ছোটে। এই কাজটি বাবলু বেশ ভালো পারে, প্রায়ই তারই হাতে ধরা পড়ে মোরগটি ; কাটার কাজটি নেয় ভজন সিং-এর নেপালী বউটি। রান্নাও সেই করে, বেশ ভালো রান্নার হাত, তবে অসম্ভব ঝাল দেয়। প্রতাপের তাতে আপত্তি নেই, বিশ্বনাথেরও না, কিন্তু মমতা একটুও ঝাল মুখে ছোঁয়াতে পারেন না। ছেলেমেয়েদেরও ঝাল খেতে দিতে চান না মমতা, তাই নিয়ে রোজ এক কাণ্ড। নেপালী বউটি কিছুতেই ঝাল কমাবে না, আর ছেলেমেয়েরা মুর্গীর মাংস খাবেই। এই মাংসে একটা নিষিদ্ধ ব্যাপারের স্বাদ আছে, এ মাংস বাড়ির মধ্যে ঢুকবে না, বাগানে বসে খেতে হবে। প্রত্যেকদিনই পিকনিক। পিকলু বাবলু খাওয়ার মাঝপথে উস-আস শব্দ করে, চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে, তবু খাওয়া ছাড়ে না।

একদিন মোরগ কাটা চলছে, এমন সময় সামনের গেট ঠেলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা প্রবেশ করলো। পুরুষটির ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মান্যগণ্য করার মত চেহারা, মহিলাটির একজন অকাল প্রৌঢ়া, অন্যজন পরিণত যুবতী। অভ্যেসবশত প্রতাপ মহিলা দুটিকেই আগে ভালো করে লক্ষ্য করলেন। টুকটুকে লাল শাল জড়ানো যুবতীটির দিকে দু'এক পলক বেশি তাকিয়ে প্রতাপের ওষ্ঠে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠলো।

বিশ্বনাথ ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, ঐ তো, সত্যেনরা এসেছে। ব্রাদার, তুমি ওদের চেনো নাকি?

প্রতাপ বললেন, মনে হচ্ছে ওঁদের মধ্যে একজনকে চিনি।

মেঘহীন আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে নির্মল রোদ, প্রতাপের চোখেরও কোনো দোষ নেই, তবু কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন চতুর্দিক ঝাপসা অন্ধকার মনে হলো প্রতাপের। কেন যেন একটা প্রবল ঝড়ের দৃশ্য মনে পড়ে গেল। সে রকম ঝড় প্রতাপ সারাজীবন আর দেখেননি। অনেকদিন আগেকার কথা, তবু প্রতাপের স্পষ্ট মনে আছে, সেই ঝড় শেষের দিবাগত রাতেই বুলার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল।"

আশ্চর্য শুরুতে বিশ্বনাথের অর্থের বিনিময়ে গান শেখাতে হয় বলে এতো অনুতাপ, সেই ওস্তাদজীই শেষে দালাল, ফোরটোয়েন্টি ফ্রড— কী না হলো? যদি কোনও অসতর্ক পাঠকের মনে হয় বিশ্বনাথের এই পতনের জন্য সুনীল আমাদের প্রস্তুত করেননি, তবে উপরের উদ্ধৃতির ওই সংলাপটি ভাবুন।

সুরটা প্রতাপের কানে লাগে। প্রথমদিন তিনি বিশ্বনাথকে বলেছিলেন, "ওস্তাদজী সক্কালবেলাতেই পূর্বী সুর গাওয়ান কেন ওদের? আশাবরী কি রামকেলি ধরালে হতো না?"

বিশ্বনাথ হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন, "আরে শিশুদের সকাল আর সন্ধে কী? ওদের তো যতক্ষণ জেগে থাকা, সেই সব সময়টাই উৎসব। তাই না? তা ছাড়া তুমি লক্ষ্য করবে, ব্রাদার, অবরোহণের সুর বাচ্চাদের গলায় সহজে আসে, ভালো আসে।"

বিশ্বনাথ মাসে পাঁচ টাকা গানের টিউশনি নিতে লজ্জা পান। সত্য; কিন্তু ইতোমধ্যেই তিনি রাগ-রাগিণী নিয়ে জোচ্চুরি করতে শুরু করেছেন। এবং তিনি মানবচরিত্রের এই ফার্স্ট প্রিন্সিপিলও আবিষ্কার করে ফেলেছেন : "অবরোহণের সুর বাচ্চাদের গলায় সহজে আসে, ভালো আসে।" সুনীল কিন্তু কোনো ভারডিক্ট দিচ্ছেন না। হয়তো আরোহণের চেয়ে অবরোহণই কখনো কখনো শ্রেয়? আমি শুরু করেছিলাম এই লিখে; 'নতুন সহস্রাব্দের সিংহদ্বারে আমরা কী উজ্জ্বল এক মশাল হাতেই না পৌঁছলাম।' এখন মনে হচ্ছে ওই প্রত্যেকটি শব্দই ভুল।

আমার এত বড়ো দুঃসাহস হয়েছিল যে এমনকি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্রের মতো দেবতাদের বিরুদ্ধে রেটোরিক ও শব্দ ব্যবহারে বিশেষণের প্রবণতার অভিযোগ করেছি। কিন্তু আমিও তো সেই এক স্খলনের কারণে অপরাধী। কিন্তু এইটুকু রিপিট করতে পারি।

আবেগবর্জিত, নিষ্কম্প, ইডিওলজির ধোঁয়া-আর-রাগের ফুলকিহীন সাহিত্যকর্ম এই প্রবন্ধের আলোচ্য, তাকে মশাল তো মোটেই বলা যায় না।

আর বাঙালির সামনে সিংহদ্বার? অন্তত পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির সামনে কোনো, নতুন এলডোরাডো কি ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহদ্বার কি দৃশ্যমান?

সেরকম মরীচিকা ১৮ কি ১৯ শতকের শেষে দেখা গেলেও যেতে পারত, কিন্তু দুই শতাব্দী দ্রুত প্রবাহের পর, বাংলা ভাষার নদী—অন্তত তার এই পশ্চিম শাখাটি—মনে হচ্ছে এক চড়া, বিল ও বালিয়াড়ির জালে আটকে আছে। সিংহদ্বার নয়, বরং বলা যাক নতুন সহস্রাব্দের কুয়াশাচ্ছন্ন মোহনার মুখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' এক স্থির বৈদ্যুতিক বাতিঘর।

কাব্যিকতার আশ্রয় নিচ্ছি না, আমার সঠিক অভিজ্ঞতা বর্ণনার চেষ্টা করছি। এটা ভূগোলের সত্য যে, গতি কমে গেলে নদী অংসখ্য স্যান্ডবাবু ও ফলসচ্যানেলের গোলকধাঁধা রচনা করে। গঙ্গার এশ্চয়ারির বারোতলা ঘূর্ণিতে পাক খেয়ে খেয়ে, দক্ষিণ ভাঙার জোয়ার-ভাটার পিচকিরিতে কেবলই এগিয়ে আর পিছু হটে, যখন অবসন্ন নাবিক নিজের অবস্থিতি বিষয়ে সন্দিহান তখন জেলিংহ্যামের বয়া কিংবা সাগরের বাতিঘর দেখার মতো 'পূর্ব-পশ্চিম' পাঠের অভিজ্ঞতা।

তখন নাবিক বোঝে সে কোথা থেকে কোথায় এসেছে। তাকে স্বয়ং ঠিক করতে হবে কোথায় সে পৌঁছতে চায়। তখন হতবুদ্ধি নাবিকের নিজের দিঙ্‌নির্ণয়ে 'পূর্ব-পশ্চিম' ধ্রুবতারা।